দীঘা সৈকতে আতঙ্ক
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

# দীঘা সৈকতে আতঙ্ক

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
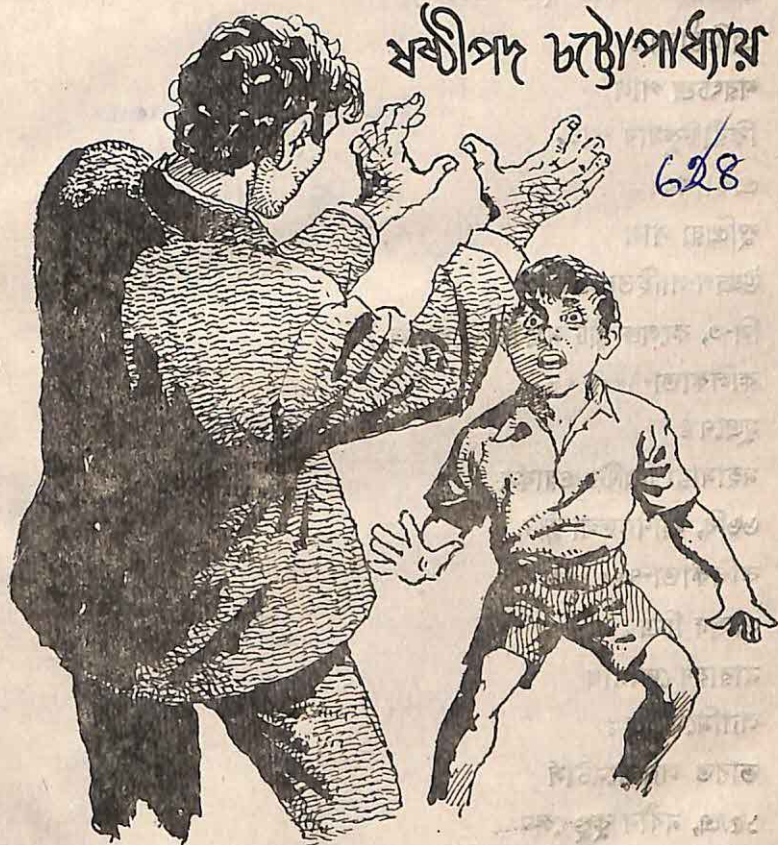


উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

DIGHA SAIKATE Rs. 10·00
ATANKA
by SASTHIPADA
CHATTOPADHYAY
Published by :
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market,
Calcutta-700007 ( 1st floor )

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ ১৩৯২
মে, ১৯৮৫

দ্বিতীয় মুদ্রণ :
শ্রাবণ, ১৩৯৪
আগষ্ট, ১৯৮৭

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল
প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ( দ্বিতলে )
কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :
মহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬৬বি, মাণিকতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রচ্ছদ চিত্র :
নারায়ণ দেবনাথ
ল্যামিনেসান :
ভারত ল্যামিনেটার্স
১৫/এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯
পরিকল্পনা :
দিব্যদ্যুতি পাল
দশ টাকা

বিশ্বভারতীর উপাচার্য

ডঃ নিমাইসাধন বসুকে

—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

## আমাদের প্রকাশিত

## আরো কয়েকটি কিশোর গ্রন্থ

### বিমল মিত্র

| | |
|---|---|
| টক-ঝাল-মিষ্টি | ১৪·০০ |
| লাল-নীল-হলদে | ১৪·০০ |
| কিশোর অমনিবাস | ১৪·০০ |

### শেখর বসু

| | |
|---|---|
| গোয়েন্দার চোখ | ১০·০০ |
| চোর এসে বই পড়েছিল | ১০·০০ |
| ভূতেরা চাউমিন ভালবাসে | ৮·০০ |

### অনিল ভৌমিক

| | |
|---|---|
| ফ্রান্সিস সমগ্র | ৩০·০০ |
| সোনার ঘণ্টা | ১০·০০ |
| হীরের পাহাড় | ৮·০০ |
| মুক্তোর সমুদ্র | ১০·০০ |
| তুষারে গুপ্তধন | ১০·০০ |
| রূপোর নদী | ১০·০০ |
| সাহারার রহস্য | ১০·০০ |

### হেমেন্দ্রকুমার রায়

| | |
|---|---|
| রত্নগুহার গুপ্তধন | ১০·০০ |
| ইন্দ্রজালের মায়া | ১০·০০ |
| পদচিহ্নের উপাখ্যান | ৬·৫০ |

### ধীরেন্দ্রলাল ধর

| | |
|---|---|
| দিগ্বিজয়ীর দিগন্ত | ৮·০০ |
| মৃত্যুবাণ | ১০·০০ |

### রবিদাস সাহারায়

| | |
|---|---|
| ছোটদের পারস্য উপন্যাস | ১২·০০ |
| ছোটদের আরব্য রজনী | ৮·০০ |
| দুর্দান্ত জলদস্যুদের কাহিনী | ১০·০০ |
| বিশ্বের নরমুণ্ড শিকারী | ৮·৫০ |
| মৃত্যুগুহার বন্দী | ৮·৫০ |
| ঠগীযুগের বিভীষিকা | ৮·৫০ |
| এ যুগের নরঘাতক | ৮·৫০ |
| ভাইবোন | ১০·০০ |

## এই লেখকের
## আরো কয়েকটি বই—

পাণ্ডব গোয়েন্দা ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম
কাকাহিগড় অভিযান
ভূতের গল্প ভয়ঙ্কর
ভূত আরো ভূত
নকুড়মামা
নকুড়মামার জয়যাত্রা
বিষমভরার বাঘ
কিশোর গল্প সংকলন
অভিশপ্ত তিডিডম
গিরিগুহার গুপ্তধন
দুরন্ত তপাই
আত্মিকালের বত্মিবুড়ি
ভাঙা দেউলের ইতিকথা
মেলা

১

বাপ্পার চোখ ছুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই যে এই রকম একটা সুযোগ এসে যাবে, তা ও ভাবতেও পারেনি। অঘ্রাণের এই সোনা-ধরা দিনে দীঘা সৈকতের হাতছানি ওকে যেন পাগল করে তুলল।

ওয়ারেন হেস্টিংস একদা যে দীঘাকে আবিস্কার করেছিলেন এবং আজও যে দীঘার আকর্ষণে শত সহস্র মানুষ ছুটে যায়, সেই স্বপ্নের দীঘায় বেড়াতে যাবার সাধ কি ওর একদিনের? ওরই স্কুলের রঞ্জন, পিনাকি, দেবাশিস ওদের বাবা-মায়ের সঙ্গে কতবার দীঘা গেছে। তাদের মুখে কত গল্প শুনেছে ও। তাছাড়া ওদের এলাকা থেকে রিজার্ভ বাস তো বছর-বছরই ছাড়ে। বছরের প্রায় সব সময়ই একটা না একটা 'দীঘা স্পেশাল' ছেড়েই থাকে। দলে-দলে লোক যায়। দীঘা সৈকতে ভ্রমণ করে অপার আনন্দ নিয়ে ফিরে আসে। আর খবরের-কাগজ-গুলো তো দিনের পর দিন লোভনীয় বিজ্ঞাপনে সুন্দরী দীঘায় আসার আমন্ত্রণ জানায় মানুষকে। সেই সব বিজ্ঞাপনের স্কেচ দেখে, এর ওর মুখে গল্প শুনে, মনে-মনে দীঘা সম্বন্ধে একটা ধারণাই করে ফেলেছে বাপ্পা। তাই মা'র মুখে দীঘার কথা শুনেই লাফিয়ে উঠল সে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে মায়ের ছু'হাত আঁকড়ে ধরে বলল—

সত্যি! কবে যাবে মা?

বাপ্পার মা সুজাতা দেবী সস্নেহে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন—বাপি সন্ধ্যের পর বাড়ি আসুক। তারপর দিনটা ঠিক হবে। যদি ছুটি পান তো কালই।

—মা! আবেগে বাপ্পার গলা দিয়ে যেন শব্দ বেরোতে চায় না। সত্যি বলছ বাপি যদি ছুটি পান তো কালই?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। যদি ছুটি পান তো কালই। নাহ'লে যেদিন ছুটি পাবেন সেদিনই, মোট কথা তোর বাপি এতদিনে রাজি হয়েছেন দীঘায় যেতে।

আনন্দে অভিভূত বাপ্পা ঘরে বসেই যেন ওর মানস চোক্ষে সমুদ্রকে দেখতে পেল।

বাপ্পার বাবা কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশের একজন পদস্থ অফিসার। নাম অসমঞ্জ রায়। এমনিতে পুলিশের লোক বলতে সাধারণতঃ যেরকম হয়, উনি কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত। অত্যন্ত সাদা-মাটা সুদর্শন লোক। মুখে হাসিটি লেগেই আছে সব সময়। স্ত্রী সুজাতা দেবী এবং বারো বছরের বাপ্পাকে নিয়ে ওনার সুখের সংসার। এই সৎ ও ভদ্র মানুষটি অঞ্চলের সকলের কাছেই অত্যন্ত জনপ্রিয়।

যাই হোক! মা'র মুখে দীঘার কথা শোনার পর বাপ্পা যেন অস্থির হয়ে উঠল। বাপি যে কখন সন্ধ্যের পর বাড়ি আসবেন, সেই আশাতেই অধীর হয়ে উঠল সে।

আনন্দের বন্যাটা মনের মধ্যে প্রবল বেগে আলোড়িত হলেও সেটা অবশ্য ছড়িয়ে পড়তে পারল না। তার কারণ, ঐ যে মা বললেন 'যদি ছুটি পান তো কালই।' কিন্তু যদি ছুটি না পান? তাহলে? তাহ'লে কবে, কতদিনে? দিন স্থির করলেও কি যাওয়া হবে? হয়তো তখন এমন একটা জরুরী কাজ এসে পড়বে, যে যাত্রা স্থগিত রেখে বাপিকে তখন ছুটির দিনেও ছুটোছুটি করতে হবে।

তাই এক দারুণ উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল বাপ্পা। অথচ বাপিটা কি! আগে থেকে অফিসকে না জানিয়ে কিছুতেই অফিস

কামাই করবেন না। বাপি নিজেই তো বলেন, সারা বছরের কত ছুটিই তাঁর পচে যায়। বাপ্পা ভেবেই পায় না ছুটি কি করে পচে। ছুটি কি আলু না বরফ চাপা মাছ? ছুটি-ছুটিই। তবুও বাপির ছুটি নাকি পচে যায়। যাই হোক, বাপি আগে থেকে অফিসকে না জানিয়ে ছুটি নেবেন না। এবং রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিন কোথাও বেড়াতে যাবেন না। বাপির ধারণা ছুটির দিনে নাকি কোন বেড়ানোর জায়গায় যেতে নেই। তাহলে নাকি খুব একটা ভীড় ভাট্টার মধ্যে পড়ে যেতে হয়। অনেক সময় পছন্দ মতো ঘর পাওয়া যায় না। সত্যিই কি? হয়ত তাই। বাপি তো অনেক বোঝেন। বাপি বুদ্ধিমান লোক। তবে বাপ্পা যদি বাপির মতন হতো, তাহ'লে যখন যেখানে মন চাইত, চলে যেতো।

যাই হোক। সারাদিনের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো বিকেল চারটেয়। অসমঞ্জবাবু বাপ্পাকে চমকে দিয়ে হঠাৎই এসে পড়লেন বিকেলে। বাপ্পা বাপিকে দেখেই অবাক হয়ে বলল – কী হ'ল বাপি! তুমি এত সকাল-সকাল ফিরলে যে?

অসমঞ্জবাবু সস্নেহে বাপ্পাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন – রোজই তো দেরি করে আসি। তাই আজ একটু সকাল করেই—ফিরলাম। বলে বাপ্পার চিবুক ধরে একটু আদর করে বললেন—কেন, মা মণি কিছু বলেননি তোমাকে?

—হ্যাঁ। তুমি ছুটি পেয়েছ বাপি?

– পেয়েছি।

– তাহলে কালই যাচ্ছি আমরা?

—কালই। খু-উ-ব সকালে। তুমি কিন্তু আজ একটু তাড়াতাড়ি ঘুমাবে এবং কাল খুব ভোরে উঠবে। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে রোদ উঠলে তারপর উঠবে, এই রকম যেন করবে না, বুঝলে?

—না-না-না। তুমি দেখে রেখো, আনন্দে হয়ত আমার সারা রাত ঘুমই হবে না। আমি খু-উ-ব ভোরে উঠব। তোমরা ওঠার অনেক আগেই উঠে পড়ব আমি। আমিই তোমাদের ঘুম থেকে

ডেকে তুলব।

অসমঞ্জবাবু ঘরে এসে মুখ হাত ধুয়ে অফিসের জামা প্যাণ্ট ছেড়ে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিলেন। বাপ্পার মা সুজাতা দেবী কফি আর টোস্ট এনে বললেন—তাহ'লে কালই যাচ্ছো তো?

বাপ্পার বাবা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

—এদিকে ছেলে তো শুনেই লাফালাফি স্থরু করে দিয়েছে। না গেলে দারুণ মন খারাপ হয়ে যেত ওর।

অসমঞ্জবাবু টোস্টে কামড় দিয়ে হাসিমুখে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন—তোমার মন খারাপ হতো না? তারপর বললেন, দিন চারেকের মতো ছুটি পেয়েছি। অনেকদিন ধরেই যাব-যাব ভাবছি, অথচ যাওয়া আর হয়ে উঠছে না। তাছাড়া বাপ্পাটা প্রায়ই দীঘা-দীঘা করে। পুরী তো তিন-চার বার গেলাম। এবার দীঘাতেই যাই। পশ্চিম বাংলার উপকূলে এমন চমৎকার সমুদ্র সৈকত রয়েছে অথচ আমরা অবহেলা করে যাই না।

সুজাতা দেবী বললেন—আমরা অবহেলা করে যাই না বলতে যদি তুমি আমাদের পরিবারের কথা বলো, তাহ'লে অবশ্য আলাদা। নাহলে আমরা সবাই দীঘায় যেতে চাই। দলে-দলে মানুষ দীঘার হাতছানি পেয়ে দীঘায় ছুটছে। তুমিই শুধু বলো পুরীর কাছে দীঘা। তুমিই তো বলো, কি আছে দীঘায়? গঙ্গার জলের মতো ঘোলা জল ছোট-ছোট ঢেউ, একেবারে বাজে জায়গা। ওতে সমুদ্র দেখার সাধ মেটে না। দীঘায় যাওয়া মানেই গঙ্গার বড় একটু আকার দেখতে যাওয়া।

বাপ্পা চোখ দু'টো বড় করে বলল—সে কথা ঠিক। শুধু বাপি কেন, অনেকেই সেকথা বলে। পুরীর কাছে দীঘা হয়তো কিছুই নয়। তবুও দীঘা দীঘাই। দীঘার কোন বিকল্প নেই। জানো বাপি, আমি শুনেছি দীঘায় অনেক ঝাউবন আছে। খুব ঘন ঝাউবন। দীঘায় অনেক উঁচু-উঁচু বালিয়াড়ী আছে।

সুজাতা দেবী বললেন—এই তো সেদিন কিসে যেন পড়লাম, দীঘা

উন্নয়ন পরিকল্পনা দীঘাকে আরো মনোরম, আরো সুন্দর করে গড়ে তুলতে চারশো চুয়াল্লিশ একর জায়গা নিয়ে দীঘাকে আরো সৌন্দর্যময়ী করে তুলছেন। এখানে তৈরী হবে ডিয়ার পার্ক। সুন্দর একটি মিনি বোটানিক্যাল গার্ডেন। একশো একর জায়গা নিয়ে তৈরী হবে একটি কৃষি গবেষণাগার। সে যাই হোক, দীঘার সববেয়ে বড় আকর্ষণ হলো সমুদ্র এবং তার সুন্দর শক্ত ও মসৃণ সৈকত? হাঁটলে পায়ে কাঁদা লাগে না। সমুদ্র প্রেমিক পর্যটকরা দীঘার সী-বীচ্‌কে পৃথিবীর বিখ্যাত 'মিয়ামী সী বীচের' সঙ্গেও তুলনা করেন।

বাপ্পা তার ডাগর-ড্যাগর চোখ মেলে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল এতক্ষণ, সব শুনে বলল—বলো কি! 'মিয়ামী সী বীচের' কথা বইতে পড়েছি। রেডিওতেও একদিন শুনছিলাম। তার সঙ্গে দীঘার তুলনা! আজকেই কাগজে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীঘা সৈকতের একটা ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন ছেপেছে। দেখবে? বলেই ফুরুৎ করে ঘর থেকে উধাও হয়ে গেল বাপ্পা।

অসমঞ্জবাবু কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে হাসতে-হাসতে বললেন—পাগল ছেলে কোথাকার।

সুজাতা দেবী সস্নেহে বাপ্পার চলে যাওয়া দেখলেন। তাঁর বুকের গভীরে তখন অপূর্ব সুখের অনুভূতি। প্রাণোচ্ছল সন্তানের এই ভ্রমণের উন্মাদনা তাঁর মনকেও মাতিয়ে তুলেছে।

*          *          *

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলেন অসমঞ্জবাবু। পাছে ঘুম ভাঙতে দেরী হয় তাই ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলেন।

সুজাতা দেবীরও ঘুম ভাঙল। আর বাপ্পা? তাকে ডাকার সঙ্গে-সঙ্গেই ফিক্ করে হেসে ফেলল সে। বলল—আমি তোমাদের চেয়েও অনেক আগে উঠেছি। লেপের গরমে চুপচাপ শুয়েছিলাম শুধু। বুঝলে? কিন্তু বাপি, শীতটা তো বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। এত ভোরে গেলে তোমার কষ্ট হবে না? তুমি যে বেশি শীত একদম সহ্য করতে পারো না।

অসমঞ্জবাবু বললেন—না। তবে তুমি কিন্তু চট করে দাঁত মেজে,

মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নাও। হীরুদা এখুনি আসলেন বলে। এখন ঠিক চারটে। আর পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বেন হীরুদা।

বাঁধা-ছাঁদা যা করবার, তা রাত্রেই করে রেখেছিলেন ওরা। এখন শুধু বাথরুমের কাজ সেরে তৈরী হয়ে নেওয়া। ওরা যখন তৈরী হচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ই বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

অসমঞ্জবাবু হেঁকে বললেন—এক মিনিট।

বাপ্পা দরজা খুলেই বাইরে এলো। হীরু কাকা মোটরের ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কত দেরী ?

বাপ্পা বলল—হয়ে গেছে।

অসমঞ্জবাবু ও সুজাতা ঘরের আলো নিভিয়ে বাইরে এসে দরজায় তালা দিলেন। তারপর মোটরে উঠে পিছনের সিটে বাপ্পাকে নিয়ে শাল মুড়ি দিয়ে তিনজনে গুছিয়ে বসতেই হীরু কাকা ঝড়ের গতিতে উড়িয়ে নিয়ে চললেন অ্যাম্বাস্যাডারটাকে।

কী প্রচণ্ড শীত আজ। রক্তমাংসর শরীরের ভেতর যে হাড়গুলো আছে, সেগুলো পর্যন্ত কনকনিয়ে উঠল ঠাণ্ডায়।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সল্টলেক্ থেকে হাওড়ায় এসে পড়লেন ওরা। এত ভোরে রাস্তা-ঘাট সব ফাঁকা। কাজেই বিলম্ব হল না। বিনা বাধায়, বিনা ট্রাফিক জ্যামে, নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে গেলেন।

এবার ট্রেনের পথ। হাওড়া থেকে লোক্যাল ট্রেনে মেছেদা। ঝক্কি কি কম ? এরপর আবার ট্রেন থেকে নেমে বাস। সেই বাসে চেপে তিন চার ঘণ্টা হু-হু করে ছোটার পর দীঘা।

মেছেদায় ওরা যখন ট্রেন থেকে নামল, তখন সকাল সাতটা। সারি-সারি বাস এই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। সোনা রোদ্দুর ঝরে পড়ছে অকৃপণভাবে। শীতের সকালে এই রোদের ঝলমলানি খুবই ভাল লাগল বাপ্পার।

অসমঞ্জবাবুকে দেখেই কয়েকজন কণ্ডাক্টর ছুটে এলো—দীঘা যাবেন নাকি বাবু ? এই যে দীঘার বাস দাঁড়িয়ে আছে এখানে। এই বাসটা আগে ছাড়বে।

অসমঞ্জবাবু বললেন কিন্তু ও বাস তো ভর্তি। আমরা একটু ভালো করে আরামে বসে যেতে চাই।

—এতেও বসার জায়গা পাবেন বাবু। ড্রাইভারের পাশে সামনের দিকে ভালো বসার সিট আছে। আরামে সব কিছু দেখতে পাবেন।

অসমঞ্জবাবু উঠলেন। উঠে ড্রাইভারের পাশে চারজনের বসার মতো লম্বা গদীওয়ালা সিট দেখে খুব খুশি হয়ে সুজাতা দেবী ও বাপ্পাকে ডাক দিলেন। বেশ ভালো বাস। ঝকঝকে-তকতকে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। চমৎকার। বাপ্পা তো দারুণ খুশি।

সামনের কাঁচ দিয়ে চারিদিক কী সুন্দর দেখা যাচ্ছে। প্রাইভেট্ বাস। অথচ লাক্সারী বাসের মতো। ক্যাসেটের গানও শোনা যাচ্ছে হিন্দী গান অবশ্য, সময় কাটানোর পক্ষে এই-ই বা মন্দ কি?

ওরা বসার সঙ্গে-সঙ্গেই ড্রাইভারও উঠল। অসমঞ্জবাবু ড্রাইভারকে বললেন—বাস কখন ছাড়বে? একটু চা-টা খেয়ে আসা যাবে?

ড্রাইভার বলল—না-না। এখুনি ছাড়বে বাস। এখন চা খেতে যাবেন না। কাঁথির আগে বড় স্টপেজও কিছু নেই। কাঁথিতে বাস দশ মিনিট থামবে। ঐখানে যা খাবার খাবেন। সব কিছু পাওয়া যাবে ওখানে। বলতে বলতেই ছেড়ে দিল বাস।

তমলুকের ওপর দিয়ে গিয়ে নলঘাটের হলদি নদীতে মাতঙ্গিনী সেতু পেরিয়ে বাস উল্কার গতিতে ছুটে চলল। তারপর বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জ পার হয়ে বেলা এগারোটা নাগাত বাস এসে পৌঁছুল কাঁথিতে। বাপ্পা বলল—বাপি, কাঁথিকেই তো কণ্টাই বলে, তাই না?

—হ্যাঁ। কাঁথি হলো মেদিনীপুর জেলার মহকুমা। এখানে কাজু বাদামের চাষ হয়। আর এই কাথি থেকেই নয় কিলোমিটার দূরে জুনপুট। জুনপুঠের নির্জন সমুদ্র তীরও ভারি মনোরম জায়গা। খেজুর, হিজলী সবই এখান থেকে কাছাকাছি। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত কপালকুণ্ডলার মন্দির এইখান থেকেই দেখতে যায় লোকে।

—আমরা যাবো না বাপি?

—ফেরার দিন যদি সময় পাই তো যাব।

সুজাতা দেবী বললেন—খুব চা তেষ্টা পাচ্ছে বাপু আমার। এবার একটু চায়ের ব্যবস্থা করো।

অসমঞ্জবাবু বললেন—অবশ্যই। যা ঠাণ্ডা তাতে এবার একটু চা না খেলেই নয়। তার ওপর এতখানি জার্নির পর খিদেও পেয়েছে। এবার পেটেও কিছু দিতে হবে।

ড্রাইভার বলল—যা করার তাড়াতাড়ি করুন।

অসমঞ্জবাবু আর বাপ্পা নিচে নামল। কাছেই চায়ের দোকান। গরম-গরম কিছু সিঙারা আর জিলিপি ঠোঙা ভর্তি কিনে সুজাতা দেবীর হাতে দিয়ে অসমঞ্জবাবু চায়ের অর্ডার দিলেন। চা তৈরী হলে এক কাপ চা সুজাতা দেবীকে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা দোকানে বসেই খেয়ে নিলেন।

ড্রাইভার তখন হর্ণ বাজিয়ে বাস ছাড়বার উপক্রম করছে।

বাপ্পা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। অসমঞ্জবাবুও উঠলেন। বাস ছাড়ল।

এবার দ্রুতগামী বাসের ভেতরে বসে চারদিক দেখতে-দেখতে সিঙারা-জিলিপি খাওয়া।

কাঁথি থেকে দীঘা ঘন্টা খানেকের পথ। বেলা প্রায় বারোটা নাগাত ওরা যখন দীঘায় পৌঁছুল, তখন আনন্দে নেচে উঠল মন।

বসে-বসেই সমুদ্র দেখতে পেয়েছিল ওরা। বাস ওদের নামিয়ে দিয়ে আরো একটু দূরে কিয়াগেড়িয়ায় উড়িষ্যা সীমান্তে চলে গেল।

ওদের এখন সামনে সমুদ্র। সমুদ্রের নীল-নীল জলরাশি, সফেন কলোচ্ছ্বাস। দীঘার নির্জন সৈকতের ঝাউবনে সামুদ্রিক বাতাস লেগে সোঁ-সোঁ শব্দ হচ্ছে। দীঘার অথৈ নীল জলরাশি নিয়ে বঙ্গোপসাগর যেন ওদের সবাইকে সমুদ্র স্নানের জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কী সুন্দর—কী সুন্দর—কী আশ্চর্য সুন্দর তার রূপ।

২
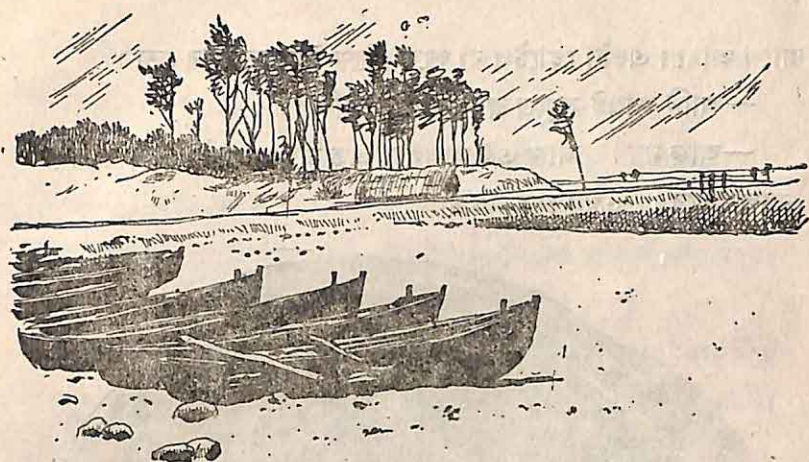
সামনে সমুদ্র দেখে আনন্দের আতিশয্যে অধীর হয়ে উঠল বাপ্পা। বাস থেকে যেখানে ওরা নেমেছিল, তার পাশেই দীঘার প্রধান স্নানের ঘাট। আবেগের উচ্ছ্বাসে 'হুর্‌রে' বলে লাফিয়ে উঠেই বাপ্পা ছুটে গেল ঘাটের কিনারে। ঘাটের কিনারে বড়-বড় বোল্ডারের ওপর সুনীল সাগর শ্বেত-শুভ্র ফ্যানার রাশি নিয়ে আছড়ে পড়ছে।

কত লোক তখন স্নান করছে সমুদ্রে। কেউ বা নুলিয়া নিয়ে কেউ বা একা-একাই। কেউ সাঁতার কাটছে। কেউ বা ঢেউ খাচ্ছে। সাঁতার কাটতে-কাটতে কেউ অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। যদিও সমুদ্রের বেশি দূরে কখনো যাওয়া উচিত নয়, তবুও সতর্কীকরণ না মেনেই বেপরোয়া মানুষেরা দলে-দলে চলে যাচ্ছে গলা জল পেরিয়ে। বাপ্পার মনে হলো, সেও ওদেরই মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্রের বুকে। ভেসে যাক্ ঢেউয়ের দোলায়-দোলায়।

অসমঞ্জবাবু ডাকলেন—বাপ্পা চলে এসো, সমুদ্রের কাছে যেও না।

—না-না, কিছু হবে না। এই তো আমি তো জলে নামিনি। তাছাড়া ভয় কি বাপি, আমি তো পুরীর সমুদ্রেও ঢেউ খেয়েছি।

—তা হোক। একেও বড় হেলা-ফেলা মনে করো না।

—বাঃ রে। এত লোক যে ঢেউ খাচ্ছে ?

—তুমিও ঢেউ খাবে। তবে এখন নয়। এখন চলে এসো।

আগে আমরা একটা হোটেল বা লজে গিয়ে উঠি, তারপর তো।

—আমি আজই সমুদ্রে স্নান করবো বাপি।

—আজ নয়। আজ এই অবেলায় এত ঠাণ্ডায় কেউ স্নান করে? কাল করবে। এখন চলে এসো

বাপ্পা চলে এলো। না এসে উপায়ই বা কি? সত্যি, বেলা তো হয়েছে। তার ওপর মা-বাবা ডাকলে তাঁরা গুরুজন। সর্বাগ্রে তাঁদের কথা শুনতে হয়। অসমঞ্জবাবু খোঁজ-খবর নিয়ে কাছেই প্রধান সড়কের ওপর নবনির্মিত একটি চমৎকার হোটেলে গিয়ে উঠলেন। নাম 'হোটেল রাম নিবাস।'

কী সুন্দর হোটেল। মেন রোডের ওপর। ঠিক যেন একটা স্টুডিও। বড় একটা ঘর। লাগোয়া আরো একটা ছোট ঘর। একটিতে খাট-বিছানা ড্রেসিং টেবিল। অপরটিতে বিশ্রামের জন্য চেয়ার ও ইজিচেয়ার পাতা। অ্যাটাচড বাথ। গ্রাউণ্ড ফ্লোরের ঘর। ভাড়া দৈনিক পঁয়ত্রিশ টাকা। অসমঞ্জবাবু তাঁদের থাকার জন্য নিচের তলায় এই ঘরটিই বেছে নিলেন।

হোটেলের ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেস হয়ে বিশ্রাম নেওয়া হলো কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে চাবি দিয়ে অন্য একটা হোটেলে গিয়ে পেট ভরে মাছ-ভাত খেয়ে তিনজনে আবার সমুদ্র তীরে এলেন। কিন্তু একি! কী আশ্চর্য! কোথায় গেল সমুদ্র।

ওরা সবিস্ময়ে দেখল তীরভূমি থেকে বহুদূরে সমুদ্র সরে গেছে।

গঙ্গার ঢেউয়ের মতো ছোট-ছোট ঢেউ কাদার ওপর ছলাৎ-ছলাৎ করছে! অর্থাৎ এখন ভাঁটার সময়। বিস্তীর্ণ চরার ওপর বড়-বড় ট্রাক মোটর ছুটছে।

বাপ্পার সব আনন্দ জল হয়ে গেল। অসমঞ্জবাবু, সুজাতা দেবী এবং বাপ্পা তিনজনেই তখন চরায় নেমে সমুদ্রের কাছে এগিয়ে যেতে লাগল। তখনও সেই দারুণ অবেলায় কত লোক সমুদ্রে স্নান করছে।

বাপ্পা চরায় নেমে বলল—দেখ বাপি, চরাটা কি বিচ্ছিরি। এই চরা পুরীর মতো বালির নয়। কাদা মাটির। তবে বেশ শক্ত। অর্থাৎ পা গেঁথে যায় না। আর সেইজন্যেই এই চরার ওপর দিয়ে মোটর লরীগুলো অনায়াসে যাতায়াত করতে পারছে। তাই না? এটাও কিন্তু দীঘার একটা আকর্ষণ। এরকম বোধহয় কোথাও নেই। যাক, আমার আশা তো মিটল।

অসমঞ্জবাবু অনেকটা নিজের মনেই বললেন—এই সেই দীঘা।

সুজাতা দেবী বললেন—কী সুন্দর না?

—হ্যাঁ। সুন্দর তো বটেই। দীঘা আজ ছোটখাটো সুন্দর একটি শহর। অথচ একদিন এই দীঘা ছিল ছোট্ট একটি গ্রাম। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রেনেলের মানচিত্রে বীরকুল পরগণার উল্লেখ আছে। আটটি

গ্রাম নিয়ে তিনশো পঞ্চাশ বর্গ মাইল বিস্তৃত ছিল এই পরগণা। দীঘাও সেই পরগণার অন্তর্গত একটি গ্রাম ছিল। এখন অবশ্য যাকে আমরা দীঘা বলে জানি, এ কিন্তু সেই আসল দীঘা নয়। প্রাচীন দীঘা ছিল সমুদ্রের আড়াই মাইল দক্ষিণে।

বাপ্পা বলল—তাহ'লে সেই দীঘা এখন কোথায় ?

অসমঞ্জবাবু হেসে বললেন—সেই দীঘা সহ সাতটি গ্রাম এখন তলিয়ে আছে সমুদ্রের জলের তলায়।

—বলো কি !

—বাংলার গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস খুব সমুদ্র বিহার করতে এবং শিকার করতে ভালোবাসতেন। সেজন্যে মাঝে মধ্যে তিনি সস্ত্রীক বেড়াতে আসতেন বীরকূলে। এখানে তাঁর একটি সুন্দর বাংলোও ছিল। সেটিও এখন সমুদ্র গর্ভে।

—কবেকার কথা বাপি ?

—সে প্রায় ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের কথা। তারও অন্তত পঞ্চাশ বছর পরে বেইলি সাহেব দীঘা বেড়াতে এসে মুগ্ধ হন। দীঘার অপার সৌন্দর্য্য দেখে মোহিত হন তিনি। দীঘার কথা তিনি কাগজে লিখতে থাকেন। এবং তাঁর সেই লেখা পড়ে দীঘার ব্যাপারে মানুষের উৎসাহ বাড়তে থাকে। যাই হোক। এর পরেও বহুকাল কেটে যায়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর চারজন ইংরেজ অনেক কষ্ট স্বীকার করে দীঘায় বেড়াতে আসেন। এসে এঁরাও অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন মিঃ জে, এফ, স্নেইথ। তিনি প্রায় এক বছর পরে মেদিনীপুরের কালেক্টরের কাছ থেকে এক খণ্ড জমি কিনে বিরাট একটি বাংলো বানালেন। তারপর সকলকে উৎসাহ দিয়ে আরো অনেক বাংলো তিনি তৈরী করালেন এখানে। ধীরে-ধীরে নতুন দীঘা গড়ে উঠতে লাগল। এরপর পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯৫৬ সালে দীঘা উন্নয়ন পরিকল্পনা করলেন।

অসমঞ্জবাবু কথা বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। একটি মোটর আচমকা সজোরে এসে সামনে ব্রেক কষতেই সচকিত হলেন তিনি।

অসমঞ্জবাবু 'স্যরি' বলে পিছিয়ে এলেন একটু। মোটরটা আবার হু-হু শব্দে উধাও হয়ে গেল। বাপ্পা অবাক চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল—এগুলো কোথায় যাচ্ছে বাবা এদিকে ?

ওখানকার স্থানীয় অধিবাসী একজন কাছে পিঠেই ছিলেন। বললেন—মোহনার দিকে।

—মোহনা! কোথায় ?

—ঐ যে ঐদিকে। ঐ দেখা যায় লাইকানির চর। ঐখানে। এখানে মৎসজীবিদের বাস তো। জেলেরা গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে জড় করে। ঐ মাছ ট্রাক বোঝাই চালান যায় নানা স্থানে।

বাপ্পা বলল—বাপি যাবে ?

—কোথায় ?

—মোহনার দিকে।

—যাবো। তবে আজ নয়। আজ ঘাটের ধারে বসি সবাই। কাল যাবো। বেড়াতে যখন এসেছি, তখন নিশ্চয়ই যাব। একদিনে সব কিছু দেখে ফেললে দেখা শেষ হয়ে যাবে। এই ছোট্ট জায়গাটা তখন আর ভালো লাগবে না।

অসমঞ্জবাবু আবার ঘাটের দিকে ফিরে এলেন। ঘাটের ধারে তখন কত কি বিক্রী হচ্ছে। কত রঙিন মাদুর। সামুদ্রিক দ্রব্যাদির খেলা। শাঁখের মালা। আরো কত কি। সুজাতা দেবী ঘুরে-ফিরে সেই সব দেখতে লাগলেন। অসমঞ্জবাবু একটা বোল্ডারের ওপর রুমাল পেতে বসলেন। আর বাপ্পা ? সে চুপচাপ বসে থাকবার ছেলেই নয়। চারিদিকের সুন্দর সুন্দর বাংলো বাড়ি কোয়ার্টার লজ দেখতে লাগল ঘুরে ফিরে। দেখতে দেখতে সী বীচ্ ধরে এক পা, এক পা এগিয়েই চলল সে। চলতে-চলতে ওকে যেন ক্রমশ চলার নেশাতেই পেয়ে বসল। খানিক যাবার পর বাপ্পা দেখল দীঘা সৈকতের সৌন্দর্য যেন আরো প্রকটিত হচ্ছে। চারিদিকে শুধু ঝাউবন আর ঝাউবন। উঁচু উঁচু বালিয়াড়ী। ঠিক যেন ছোটখাটো বালির পাহাড় সব। ও যেই বাঁধা রাস্তার শেষে বালিয়াড়ীতে নামতে যাবে অমনি একটা ঝুপড়ির আড়ালে

থেকে সরেঙ্গা লম্বা রোগা মতো পাগল-পাগল চেহারার একটি লোক লাফিয়ে·পড়ল ওর সামনে। লোকটির মাথায় একটি লাল ফিতের ফেত্তি বাঁধা। হাতে বল্লম। মাথার চুলগুলি রুক্ষ এবং ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া। পাকানো গোঁফ। পরণে একটি জাঙ্গিয়া ও গেঞ্জিবিহীন হাতকাটা সোয়েটার। সেটি যেমনি ময়লা, তেমনি ছেঁড়া। লোকটি ওর পথ রোধ করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। তারপর কর্কশ গলায় বলল—এই তুম কৌন হ্যায় রে?

বাপ্পা তো আচমকা ঐ মূর্তিমানকে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। তবু নিজেকে সামলে অতি কষ্টে কাঁপতে-কাঁপতে বলল—আমি বাপ্পা।

—তোর বাড়ি কোথায়?

—আমার বাড়ি কলকাতায়। সল্ট লেকে।

লোকটি হঠাৎ বল্লমটি বালিতে গিঁথে অনেকটা আর্চ করার ভঙ্গিতে একটা ডিগবাজি খেয়েই বলে উঠল—

আমার নাম অ্যাণ্টনি ধিড়িঙ্গী
নইকো ট্যাস, নই ফিরিঙ্গী
হ্যান করেঙ্গে ত্যান করেঙ্গে
পকেটকা পয়সা লুঠকে লেঙ্গে।

বাপ্পা সভয়ে একটু পিছিয়ে এলো।

লোকটি বলল—কি আছে তোর কাছে বার কর।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল বাপ্পার। বলল—আমার কাছে অন্য কিছু তো নেই, সামান্য কিছু খুচরো পয়সা আছে।

—অন্য কিছু চাইছে কে তোর কাছে? খুচরো পয়সাগুলোই দে। ডোণ্টডিলে, একদম দেরি নয়—কুইক। বার কর শিগগির। জলদি কর।

বাপ্পা পকেট হাতড়ে ভয়ে-ভয়ে যা ছিল, সব বার করে দিল। লোকটি সেগুলো হাত পেতে নিয়ে আনন্দে চোখ দু'টো বড়-বড় করে বলল—বাঃ! বাঃ! বেড়ে-বেড়ে। এতে আমার এক কাপ চা হবে। একটা পাঁউরুটি হবে। উপরন্তু বিড়িও হয়ে যাবে গোটাকতক। ওঃ হো: মজা!

বাপ্পা পয়সাগুলো দিয়ে চলে আসতে যাচ্ছিল।

লোকটি বলল—হোয়াই আর ইউ রিটার্ণ ব্যাক? আমি একটা ব্রেনলেস। আমাকে দেখে এত ভয় পাবার কী আছে। আমি যখন পয়সা পেয়ে গেছি, তখন আর কোন ভয় নেই তোর।

বাপ্পা এবার একটু সাহস পেয়ে বলল—আমার কাছে যদি পয়সা না থাকত?

– তাহ'লেও ভয়ের কিছু ছিল না। কেননা আমি ছোট ছেলেদের কিছু বলি না। তবে তোকে দেখেই বুঝেছি তুই বেশ বড়লোকের ছেলে। তোর কাছে হাত পাতলে টু-পাইস পাওয়া যেতে পারে।

বাপ্পা এবার হেসে বলল—তা এই কি তোমার হাত পাতার নমুনা? তুমি বেশ মজার লোক তো?

লোকটি হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ করে হাসতে-হাসতে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে চলতে লাগল দীঘা বাজারের দিকে মুখ করে। আর বলতে লাগল—দুর্গা মায়ী বাচাকে রাখখা—দুর্গা মায়ী বাচাকে রাখখা। যো দেগা উসকা ভি ভালা হোগা, যো নেহি দেগা উসকা ভি ভালা হোগা। সীতারাম ঝটপট···।

বাপ্পা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে-আস্তে বালিয়াড়ীর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। একটা বালির ঢিপির ওপর উঠতেই দূরের অনেক কিছু দেখতে পেল। কত ঝাউবন এখানে। ও সাহস করে সেই ঝাউবনের দৃশ্য দেখতে-দেখতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। কী সুন্দর একটা জিনিস চক-চক করছে সেখানে। সূর্যের আলো পড়ে চোখ যেন ঠিকরে পড়ছে। বাপ্পা কাছে গিয়ে সেটা হাতে নিয়েই অবাকহয়ে গেল। দেখল একটা রুপোর পদক। তাইতে ইংরাজীতে নাম লেখা আছে 'নীতা সিং' জিনিসটার মূল্য কতখানি, বাপ্পা তা জানে না। শুধু অনুমান করল, নিশ্চয়ই কোন নীতা সিং তার মা-বাবার সঙ্গে দীঘা বেড়াতে এসে এই পদকটা এখানে হারিয়েছে, এবং পরে মা-বাবার কাছে খুব বকুনিও খেয়েছে। যাক, এটা বাপির হাতে দিয়ে দিলে বাপি নিশ্চয়ই এটা ঠিক লোকের হাতে পৌছে দিতে

পারবেন। কেননা বাপি তো পুলিশের লোক। এই ভেবে বাপ্পা পদকটা পকেটে নিয়ে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে হঠাৎ কি মনে হতেই ফিরে এলো বাপ্পা। একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে যেখানে পদকটা পেয়েছিল সেইখানে একটি গাছের গায়ে নিজের নামটা লিখে রাখল। তারপর আবার এগিয়ে চলল সামনের দিকে। এক জায়গায় দেখল ছোট ছোট হোগলার ঘরে সমুদ্রের মৎস্য সন্ধানীরা তাদের ছোটোখাটো সংসার পেতে বসে আছে। এদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। কত মাছ কেনা-বেচা হচ্ছে সেখানে জেলেরা গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে ডাঁই করে রেখেছে। বাপ্পা জানে মরশুমে এখানে মাছের উৎপাদন হয় ষাট হাজার টন। কী দারুণ আঁশটে গন্ধ। গা যেন ঘুলিয়ে ওঠে। মাছের নামে যেন ঘেন্না ধরে যায়। বাপ্পা আরো এগিয়ে চলে। ঐ তো মোহনা। সারি-সারি নৌকো বাঁধা আছে সেখানে। লাইকানি নদী এসে মিলিত হয়েছে সমুদ্রে। মাঝিরা অনেকেই স্নান সেরে খেতেবসেছে। কেউ-কেউ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবার জন্য তৈরীও হচ্ছে। আর সুবিস্তীর্ণ বালুচরে শ'য়ে-শ'য়ে লোক বসে জাল বুনে চলেছে আপন মনে। বাপ্পা অনেকক্ষণ ধরে সেই জাল বোনা দেখতে লাগল। অদূরে দ্বীপের মতো একটা স্থানে ঘন ঝাউবনের শোভা দেখল। একজনকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা ঐ যে জায়গাটা, ওটার নাম কি গো ?

—ওর নাম শঙ্করপুর।

—ওখানে লোক বাস করে ?

—নিশ্চয়ই। এখানে সর্বত্রই মানুষ বাস করে। বাঘ ভালুক এখানে নেই। কি নাম তোমার ?

—আমার নাম বাপ্পা রায়।

—দীঘা বেড়াতে এসেছ বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—সঙ্গে কে আছেন ?

—মামণি, বাপি তুজনেই আছেন।

—না না, এখানে ?

—এখানে আমি একা।

—ও সর্বনাশ। শিগ্‌গির পালাও এখান থেকে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এতখানি পথ চলে এসেছ ফিরতে যে রাত্রি হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি যাও। আর একটু পরেই ফাঁকা হয়ে যাবে সব।

বাপ্পা গর্বের সঙ্গে বলল—হোক না ফাঁকা। আমি ফাঁকা জায়গাতেও ভয় পাই না।

—ওঃ হোঃ। তুমি বুঝছ না কেন খোকা, ভয় না পেলেও এসব জায়গা ভাল নয়। অনেক রকমের বদ লোক ঘোরা ফেরা করে এখানে। তাছাড়া এই দারুণ শীতে উঁচু নীচু রাস্তায় অন্ধকার হয়ে গেলে তুমি ফিরবে কি করে?

বাপ্পা বলল—বদ্‌ লোকই হোক আর যেই হোক, কেউ আমার কিছু করতে পারবে না। আমার বাবা কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশের একজন নাম করা লোক। সবাই ভয় করে আমার বাবাকে।

—তা হোক। তবু তুমি যাও। তবে সাবধানে! উঁচু বালিয়াড়ীর ওপর দিয়ে যাবে কিন্তু। কেননা এখন জোয়ার আসার সময় হয়ে গেছে। এ তো তোমাদের গঙ্গার জোয়ার নয়, সমুদ্রের। খুব তাড়াতাড়ি জল চলে আসে।

বাপ্পাও অবশ্য দেরি করল না আর। বিশেষতঃ এই সব শোনার পর কে আর দেরি করে? মোহনা দেখবার সখ ছিল মিটে গেছে। তবে একটা ভুল সে করেছে। এখানে আসবার আগে বাপিকে বা মা মণিকে একবার জানিয়ে আসাটা উচিৎ ছিল তার। এতক্ষণে তাঁরা নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি সুরু করে দিয়েছেন। অবশ্য সত্যিকথা বলতে কি ও যে এখানে আসবে তার তো কোন ঠিকই ছিল না। সে নিজের মনে ঘুরতে ঘুরতেই চলে এসেছে এখানে। বেশ খানিকটা চলে আসার পর সমুদ্রের খুব সাংঘাতিক রকমের গর্জন শুনতে পেল বাপ্পা। সেই সঙ্গে দেখতে পেল বড়-বড় ঢেউয়ের জলোচ্ছ্বাস। এক এক লহমায় সমুদ্র যেন দীঘা সৈকতকে গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে আসছে এক সময় দিগন্তের বুক থেকে দিনান্তের শেষ রঙটুকুও মুছে গেল। ধীরে-ধীরে ঘন অন্ধকার গ্রা করল সৈকত বালিয়াড়ী ও ঝাউবনকে।

৩

সেই অন্ধকারে বাপ্পা একাই সাহসে ভর করে এগিয়ে চলল। না যাওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি? যেভাবেই হোক পৌছতে তো হবে? উঁচু নিচু বালিয়াড়ীতে অনভ্যস্ত হাঁটা চলার পথ চলতে লাগল বাপ্পা।

একটা টর্চ নেই কিছু নেই। আপন খেয়ালে চলে এসে এখন বুঝতে পারছে কি ভুলই না করেছে ও।

কন-কনে ঠাণ্ডায় ওর হাত পা জমে যাচ্ছে যেন।

হঠাৎ ও কি! কী ওটা!

বাপ্পা থমকে দাঁড়াল। দেখল আগুনের গোলার মতো দুটো চোখ ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে কি ভীষণ চাহনি। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওর।

বাপ্পা তবু সাহসে ভর করে হাতে তালি দিল একবার। মুখে শব্দ করল 'হ্যাট্-হ্যাট্'। কিন্তু ফল হোল উল্টো। ততক্ষণে আরো কয়েকটি ঐরকম জ্বলন্ত চোখ ওর দিকে তাকালো ঐ একইভাবে।

বাপ্পা আর থাকতে পারল না। জোরে চেঁচিয়ে উঠল—কে আছো বাঁচাও।

সঙ্গে সঙ্গে একটা টর্চের আলো সেখানে এসে পড়ল। এবং সেই আলোর সঙ্গে-সঙ্গেই নিভে গেল সেই জ্বলন্ত চোখগুলো।

টর্চের আলো ধীরে-ধীরে চারদিকে ঘুরপাক খেয়ে বাপ্পার মুখের ওপর এসে পড়ল। দু'জন লোক টর্চ হাতে কাছে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলল—কে! কে তুমি?

—আমি বাপ্পা।

বাপ্পা অন্ধকারে লোক দুটোকে ভাল করে দেখতে পেল না। শুধু বুঝল ওরা ফুল প্যাণ্ট আর ফুল হাতা জামার উপর সোয়েটার পরে আছে। ওরা বলল—বাপ্পা, তোমার বাড়ী কোথায়?

—কলকাতায়।

—কলকাতায়? এখানে এই অন্ধকারে একা তুমি কী করছ?

—কিছু করিনি। আমি মোহনা দেখতে গিয়েছিলাম। ফিরতে খুব দেরি হয়ে গেল। এই অন্ধকারে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এমন সময় দেখলুম, আগুনের গোলার মতো কতকগুলো চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার খুব ভয় পাচ্ছে এখন। আপনারা আমাকে একটু দীঘার দিকে এগিয়ে দেবেন?

লোক দুটো পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। একজন বলল—ও। তুমিই তাহলে সেই ছেলে! মা-বাবা যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছে অমনি সেই ফাঁকে ডানা মেলে উড়ে পড়েছ। ওদিকে তোমার মা-বাবার কি অবস্থা তা জান?

—কী হয়েছে তাদের?

—কী হয়নি সেটাই বলো? অনুমান করো দিকিনি কারো ছেলে হারালে তার মা-বাবার অবস্থা কি হতে পারে? শোন, তোমার মা ফিট হয়ে পড়ে আছেন। আর বাবা থানা পুলিশ করে তোলপাড় করছেন চারিদিক। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। এই ভাবে কেউ আসে?

বাপ্পা করুণ স্বরে বলল—আর কখনো আমি মা-বাবাকে না বলে কোথাও যাব না। আমাকে আপনারা একটু এগিয়ে দিয়ে আসবেন চলুন।

লোক দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আচ্ছা এসো।

বাপ্পা ওদের সঙ্গে কিছুটা পথ এগোবার পর এক সময় ওরা দুজনেই থামল।

বাপ্পা বলল—কী হল থামলেন যে ?

একজন বলল—তোমার বাবা তো পুলিশে কাজ করেন, তাই না ?

—হ্যাঁ। আমার বাবা গোয়েন্দা পুলিশের একজন বড় অফিসার।

—আমরা চিনি তোমার বাবাকে। তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের বিশেষ সদ্‌ভাব নেই। শুধু তোমার বাবার সঙ্গে কেন, কোন পুলিশের সঙ্গেই সদ্‌ভাব নেই আমাদের।

বাপ্পা অবাক হয়ে বলল—কেন নেই ?

—সে তুমি বুঝবে না !

—কেন বুঝব না ? আমি কি বাচ্চা ছেলে ? আমার বারো বছর বয়েস। আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি।

—আমরা সমাজবিরোধী। তোমার বাবা আমাদের একবার জেলে পাঠিয়েছিলেন আমরা বহু কষ্টে সেই জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছি।

—বেশ করেছেন। আমার বাবার হাতে আইন ছিল, তাই আমাদের জেলে পুরেছিলেন। আপনাদের হাতে ক্ষমতা ছিল, তাই জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছেন। কিন্তু আমি তো কোন দোষ করিনি। কাজেই আপনাদের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। দয়া করে আপনারা আমাকে একটু এগিয়ে দিন।

লোক দু'টো তখনো এক পা'ও না এগিয়ে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রইল।

বাপ্পা বলল—কী হলো ? যাবেন না ? আমার বাপি পুলিশ হতে পারেন। তবুও তিনি মানুষ। তাঁর পথ হারানো ছেলেকে আপনারা যদি উদ্ধার করে তাঁর হাতে পৌঁছে দেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই তিনি সেই উপকারের বিনিময়ে আপনাদের হাতে হাতকড়া পরাবেন না। যদি পরান তাহ'লে জেনে রাখবেন বাপির সঙ্গে আর কখনো কথা বলব না আমি। একদিন স্কুল যাবার নাম করে পালিয়ে গিয়ে এমন হারিয়ে যাব যে আর কখনো বাড়ি ফিরবো না।

—তুমি নিতান্তই ছেলে মানুষ তাই এই সব কথা বলছ। তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দিলে হয়তো তিনি খুশিই হবেন খুব। কিন্তু তবুও উনি পুলিশ। আমাদের দেখলেই তাঁর মাথার ব্রহ্ম-তালুতে

কর্তব্যবোধটা কড়াং করে উঠবে .রক্ষণেই হাতে হাতকড়া পরিয়ে আবার শ্রীঘরে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের।

—আমি আপনাদের কথা দিলাম যদি আপনারা আমাকে আমার বাপির কাছে পৌঁছে দেন, তবে আমি তাঁর পায়ে ধরে অনুরোধ করব তিনি যেন আপনাদের কিছু না বলেন।

—তা না হয় করলে। কিন্তু তোমার ব্যাপার নিয়ে দীঘা এখন পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ। এখানকার পুলিশ আমাদের দেখতে পেলে ছাড়বে কেন? আমরা খুব কুখ্যাত গুণ্ডা। তা কি জান? তবে একটু অপেক্ষা করো, আমরা তোমার ব্যাপারটা নিজেদের ভেতরে একটু আলোচনা করে দেখি কী করা যায়, তোমাকে নিয়ে।

বাপ্পা বলল—যা করবেন তাড়াতাড়ি করুন। আমার আর তর সইছে না।

লোক দুজন টর্চ নিভিয়ে সেই অন্ধকারে সিগারেট ধরাল। তারপর বাপ্পার কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে ফিস-ফিস করে কি সব যেন বলতে লাগল। এত চাপা কথাবার্তা যে বাপ্পা কিছুই বুঝতে পারল না।

এই কনকনে ঠাণ্ডায় বাপ্পা তখন জমে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে ব্যাকুল সামুদ্রিক বাতাস জোরে বইতে থাকলে ঝাউবনে ঝাউয়ের ঝালরগুলি সর সর শব্দ করে মাথা দোলাচ্ছে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ খুবই দ্রুতগতি। তার মানে জোয়ার আসছে—জোয়ার আসছে—জোয়ার আসছে। বাপ্পা এখন অবশ্য খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ীর ওপর আছে। কাজেই সমুদ্রের জল সেখান পর্যন্ত যে এসে পৌঁছবে না, এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। কিন্তু ঐ লোক দু'জনের মতলব তো ভালো বলে মনে হচ্ছে না। ওরা কেন ওকে নিয়ে অত আলোচনা করছে? ওরা না যাবে সেকথা তো বলে দিতেই পারে। বাপ্পা কি একা যেতে পারবে না? এত কী ফিস-ফিস করার আছে?

বাপ্পা অনেকক্ষণ ধরে কান পাতার পর এবার একটু স্পষ্ট কথাবার্তা শুনতে পেল ওদের।

একজন বলল—কী দরকার আবার ঐ সব ঝামেলায় জড়াতে যাবার।

অপরজন বলল—এমন মওকা হাতছাড়া করা উচিৎ হবে না। প্রতিশোধ নেবার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।

—কিন্তু ছেলেটা তো কোন দোষ করেনি?

—আমার ছেলেটা কি দোষ করেছিল? সেদিন যদি ঐ শয়তান আমাকে জেলে না ঢোকাতো, তা'হলে কি ভেবেছিস ঐ ভাবে বেঘোরে মরত আমার ছেলেটা? আমার একমাত্র ছেলেকে আমি যার জন্য হারিয়েছি, আমি চাই সেও তার ছেলেকে আমার জন্য হারাক। সেদিন যদি আমি জেলে না যেতাম, তাহ'লে আমার বউ-ছেলে আমার ঘরেই থাকত। না আমার বউ পেটের জ্বালায় ওর বাপের বাড়িতে যেতে যাবে, না বাস চাপা পড়ে মরবে। আমি বলে তাই এখনো মানুষ আছি। অন্য কেউ হলে হয়তো পাগল হয়ে যেত। পুত্রশোক কি তা তুই কি বুঝবি? তুই তো বিয়ে থা করিসনি, বেশ আছিস।

—তাই বলে তুইও কি ঐ ছেলেটাকে বিনা দোষে মেরে ফেলবি? ভেবে দেখ, আমাদের এখন সামনে কাঁটা পিছনেও কাঁটা। একবার যখন দল ছেড়ে এসেছিস তখন আর সেখানে ফেরবার মুখ নেই। বরং ওরাই আমাদের মারবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। আর এদিকে রয়েছে পুলিশের তাড়া। এর ওপর একটা পুলিশের ছেলেকে মার্ডার করলে ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াবে তা বুঝতে পারছিস? তার চেয়ে বরং এইসব ছেড়ে দে। আমরা আসল যে কাজের জন্যে এখানে ঘুর ঘুর করছি সেই কাজ আগে হাসিল করি। যে ভাবেই হোক আগে সর্দারকে দুনিয়া থেকে সরাই। তারপর অন্য কাজে হাত দেবো। এখন এই সব কাজে ঝামেলায় জড়িয়ে কোন রকমে যদি আবার অ্যারেষ্ট হয়ে যাই তো আমাদের শত্রুরই সুবিধে হবে। মাথায় উঠবে তখন হিস্যা নেওয়া।

—বুঝলাম। কিন্তু এই ছেলেটাকে কোন রকমেই ফিরতে দেওয়া হবে না।

বাপ্পার পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিম স্রোত নেমে গেল। সে বুঝতে পারল যে সে এমন পাল্লায় এসে পড়েছে যে এই মুহূর্তে তার জীবনই বিপন্ন। সে তখন উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে একটু-একটু করে অনেকটা দূরে সরে গেল। তারপর ঝাউবনের বাইরে এসেই ছুটতে লাগল উর্দ্ধশ্বাসে। কিন্তু সেই অন্ধকারে কি ছোটা যায়? পা চলছে না। তবু সে ছুটতে লাগল।

হঠাৎ কোথা থেকে ঘেউ-ঘেউ করে কয়েকটা কুকুর তেড়ে এলো ওর দিকে।

বাপ্পা ভয়ে চিৎকার করে আরো জোরে ছুটতে গিয়েই পা হড়কে সেই বালিয়াড়ীর ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল একদম নিচে। কুকুরগুলো সামনে ঘেউ-ঘেউ করে চেঁচাতে লাগল। বালির ওপর থেকে সমস্বরে চিৎকার করতে করতে শয়তান কুকুরগুলোও নেমে আসতে লাগল। কী ভয়ঙ্কর ভাবে তাড়া করে আসছে ওরা। যেন ধরতে পারলে দলবদ্ধভাবে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে খেয়ে ফেলবে ওরা।

বালিয়াড়ীর ওপর থেকে পড়ে গিয়েই বাপ্পা দেখতে পেল হু'টো জোরালো টর্চের আলো চারিদিকে প্রতিফলিত হচ্ছে। অর্থাৎ লোক হু'টো খুঁজছে ওকে।

বাপ্পা এখন নিজেকে লুকিয়ে ফেলবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কুকুরগুলোর জন্যে পারল না। কুকুরগুলো ওকে ভয়ঙ্কর রকমের তাড়া করছে। ওকে দেখেই চিৎকার আর লাফালাফি করছে? কামড়াচ্ছেও না। অথচ ভাবটা এমন যে পেলে আস্ত গিলে খায়।

বাপ্পা এখান থেকেই আলোক মালায় সজ্জিত দীঘাকে দেখতে পেল। আর একটু ছুটে এগোতে পারলেই দীঘা সৈকতের বোল্ডার ধরে বাঁধানো রাস্তাটায় গিয়ে পৌছবে ও।

কিন্তু ছুটতে গেলেই যদি কামড়ে দেয় কুকুরগুলো?

এদিকে ঐ কুকুরগুলোকে ঐভাবে চেঁচাতে দেখে এদিকে আরও কিছু কুকুর তাদের ক্রুদ্ধ প্রত্যুত্তর দিল। তারপর যেই না ঐ কুকুরগুলো ওর দিকে এগোতে যাবে অমনি শুরু হ'ল কুকুরে-কুকুরে প্রচণ্ড খেয়োখেয়ি।

এদিকে সেই টর্চের আলো চারিদিকে প্রতিফলিত হচ্ছে! ঝাউবন বালিয়াড়ী সৈকত ও সমুদ্রের কিনারা পর্যন্ত ঘুরপাক খাচ্ছে আলো। তারপর একসময় ওর ওপরও এসে পড়লো। বাপ্পা বুঝল আর সে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। তাই দু'হাতে মুখ ঢেকে মৃগ শিশুর মতো কাঁপতে লাগল সে।

বাপ্পা বুঝতে পারল ওর ওপর টর্চের আলো ফেলে বালিয়াড়ীর ওপর থেকে দ্রুত নেমে আসছে ওরা। এবং যেভাবে নেমে আসছে তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, এক সাংঘাতিক রকমের প্রতিশোধ স্পৃহা এবং হত্যালীলা মাথায় খেলছে ওদের।

একথা মনে হতেই বাপ্পা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর মরিয়া হয়ে দৌড় লাগাল সে। দৌড়-দৌড়-দৌড় জোরে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় পাথরে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল বাপ্পা! অমনি সেই অন্ধকারে কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। তারপর রোমশ কঠিন একটি বাহু ওকে তুলে নিল অনায়াসে। সে তার হাত দু'টো বাপ্পার মুখ এমন ভাবে টিপে রইল যে ওর আর এতটুকু চিৎকার করবারও ক্ষমতা রইল না।

৫
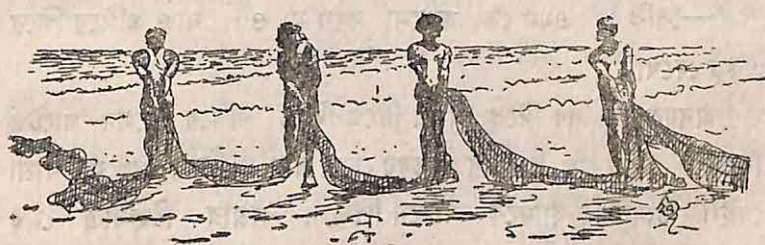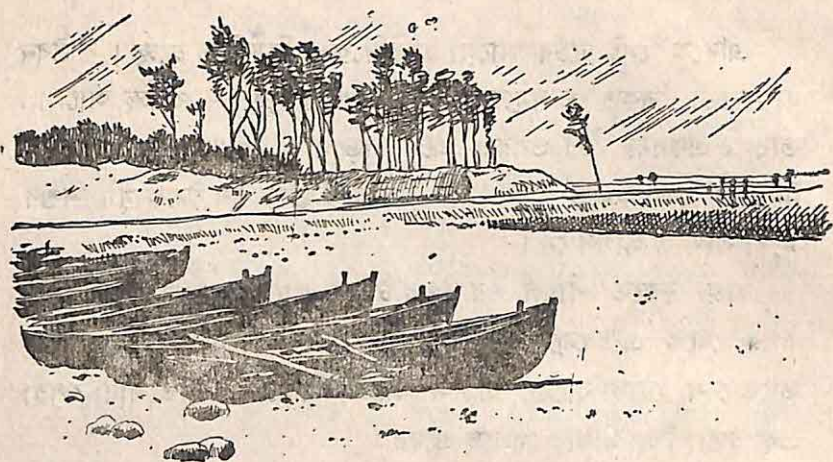
একটা দোকানে শাঁখা পুঁতি ইত্যাদির মালা এবং অন্যান্য কিছু জিনিসের দর দাম করছিলেন সুজাতা দেবী। অসমঞ্জবাবুও হাতির দাঁতের কাজ করা একটা ছুরি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হ'ল বাপ্পার কথা। তাইতো ছেলেটা অনেকক্ষণ তো নেই। কোথায় গেল ছেলেটা? সুজাতা দেবী ডাকলেন—বাপ্পা!

কোথায় বাপ্পা!

অসমঞ্জবাবু বললেন—এদিক-ওদিক কোথাও গেছে হয়ত।

—সেকি! এমন তো কখনো করে না ও। যাও এগিয়ে গিয়ে একটু দেখো।

অসমঞ্জবাবু সব দিকে নজর দিতে-দিতে এগিয়ে গেলেন ঘাটের দিকে! সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলেন বাপ্পা নেই। ডানদিকে-বাঁদিকে সামনে-পিছনে, বাপ্পার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

ঘাটে অন্যান্য আরো অনেক লোক ছিল। সবাই সচকিত হয়ে উঠল এবার। যারা আগে বাপ্পাকে দেখেছিল তারা বলল—হ্যাঁ-হ্যাঁ। এই তো একটু আগেই এখানে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা।

কেউ বলল—আমি একবার নিচে নামতে দেখলুম বটে। কিন্তু কোনদিকে গেল তা বলতে পারছি না।

কেউ বলল—বাজারের দিকটা একবার দেখুন তো ছেলে-মানুষ, যদি কিছু মজার জিনিস দেখে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে।

সুরু হ'ল তোলপাড়—তোলপাড়—তোলপাড়। সুজাতা দেবীকে ঘাটে বসিয়ে রেখে অসমঞ্জবাবু ছুটোছুটি করতে লাগলেন। যেদিকে বাপ্পা গিয়েছিল সেদিকেও খানিকটা পথ গিয়ে কোন হদিস না পেয়ে ফিরে এলেন তারপর ডানদিকের পথ ধরে যেখানে ঝাউবন আরো গভীর—আলো ঘন, সেদিকেও কিছুটা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু না। ডানদিক-বাঁদিক চারিদিকেই শূন্যতা। কোথাও নেই বাপ্পা।

অন্যান্য ট্যুরিস্টরা যারা বেড়াতে এসেছিল এখানে তারাও তখন উৎকণ্ঠিত হ'ল। তাদের মধ্য থেকেও কিছু উৎসাহী যুবক দিকে-দিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করল।

কিন্তু যে যেদিকে গেল সে, সেদিক থেকেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। না। কোনদিকেই বাপ্পা নেই। চোখের সামনে থেকে, এত মানুষের ভীড়ের মধ্যে থেকে, ছেলেটা একেবারেই উবে গেল যেন।

ক্রমে দিনের আলো নিভে এলো। সন্ধ্যার অন্ধকারে সুজাতা দেবী ঘাটের সিঁড়িতেই 'উঃ মাগো' বলে সজ্ঞাহীন অবস্থায় লুটিয়ে পড়লেন।

অসমঞ্জবাবু একা অসহায়ভাবে কি যে করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না। স্ত্রীকে দেখবেন? ডাক্তার ডাকবেন? ছেলেকে খুঁজবেন? না পুলিশের খবর দেবেন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না তিনি।

চারিদিকে ভীড়ে-ভীড়।

এ রকম তো কখনো হয়নি। হাজারে-হাজারে ট্যুরিস্ট সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে এখানে যাতায়াত করেন, কিন্তু এমন তো কখনো ঘটেনি। দীঘা অতি নিরুপদ্রব ভদ্র এবং শান্ত জায়গা। বরং এখানকার শান্ত সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে আচমকাভাঁটার টানে অথবা হাঙরের আক্রমণে নিখোঁজ হয়েছে অনেকে। যারা শুধুই সমুদ্রের শিকার হয়েছে পরে অবশ্য তাদের মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখা গেছে। সমুদ্র শুধু প্রাণটুকু কেড়ে নিয়েই দেহটিকে পরিত্যক্ত আবর্জনার মতো

কিনারে ফেলে দিয়েছে। আসলে দীঘা সৈকতের সৌন্দর্য এবং আতঙ্ক যা কিছুই বলো তা এই সমুদ্র। কিন্তু তাই বলে সকলের জোড়া-জোড়া চোখের সামনে এমন রহস্যময় ছেলে হারানো সত্যি বলতে কি এই প্রথম।

যাই হোক! অসমঞ্জবাবুর এই অসহায় অবস্থায় কিছুই করতে হ'ল না তাঁকে। দলে-দলে কত যে মানুষ এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল তাঁর দিকে তার ঠিক নেই।

সুজাতা দেবীর ঐরকম অবস্থা দেখে তারাই গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনল। কয়েকজন মহিলা সুজাতা দেবীর সেবা শুশ্রূষার কাজে লেগে গেলেন। এই ফাঁকা জায়গায় প্রচণ্ড শীত বলে কাছাকাছি একটি বাড়িতে নিয়ে আসা হ'ল সুজাতা দেবীকে। কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক অসমঞ্জবাবুকে নিয়ে থানায় গিয়ে রিপোর্টও করালেন।

এখানকার থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার অসমঞ্জবাবুর পরিচয় পেয়ে সসম্মানে তাঁকে বসতে বললেন। এবং সব কিছু ডায়রিতে লিখে নিয়ে বললেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। আপনার ছেলেকে আমরা খুঁজে বার করবই। অবশ্য সমুদ্রে যদি তলিয়ে গিয়ে না থাকে এবং অন্য ক্ষতি না হয়ে থাকে, তাহলে ছেলে আপনি পাবেনই। তবে জেনে রাখুন, দীঘায় কোন ক্রিমিন্যাল নেই। থাকলেও তারা সক্রিয় নয়। কারণ, সমুদ্রের ধারে এখন ট্যুরিস্টের মেলা। সেখানে অত লোকের চোখের সামনে এলটা ছেলে সমুদ্রে নামবে অথচ কেউ দেখবে না বা একটা ছেলেকে চুরি করে নিয়ে পালাবে কেউ দেখতে পাবে না, তা হয় না। যাই হোক। আপনি হোটেলে যান। আমরা ব্যবস্থা করছি আপনার ছেলেকে উদ্ধার করবার।

অসমঞ্জবাবু বললেন—আমি কি আপনাদের সঙ্গে থাকব ?

—কোন প্রয়োজন নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার ছেলে নিশ্চয়ই দূরে কোথাও গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। এদিকে লাইকানির চর ওদিকে চন্দনেশ্বর সব তোলপাড় করছি আমরা। এবং ঘণ্টায়-ঘণ্টায় আপনি আমাদের অনুসন্ধানের খবর পাবেন।

অসমঞ্জবাবু তখন আর যেন নিজের মধ্যে নিজেই নেই। কেন কে জানে বার বারই তাঁর মনের মধ্যে কু গাইতে লাগল। আসলে তিনি পুলিশের লোক তো। অভিজ্ঞতাও অনেক। কাজেই বিপদের সম্ভাবনাকে কোন মতেই অন্যদের মতো উড়িয়ে দিতে পারলেন না।

অসমঞ্জবাবু সকলের সঙ্গে আবার ঘাটের কাছে ফিরে এলেন। তারপর যে বাড়িতে তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছিল সেইখানে এসে স্ত্রীকে সঙ্গে করে ফিরে এলেন হোটেলে। আপাততঃ সুজাতা দেবী একটু সুস্থ হোন। তারপর তিনি নিজেই অনুসন্ধান চালাবেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন একটা অশুভ মেঘের কালো ছায়া হঠাৎ আবির্ভাব হয়েছে তাঁর ভাগ্যাকাশে।
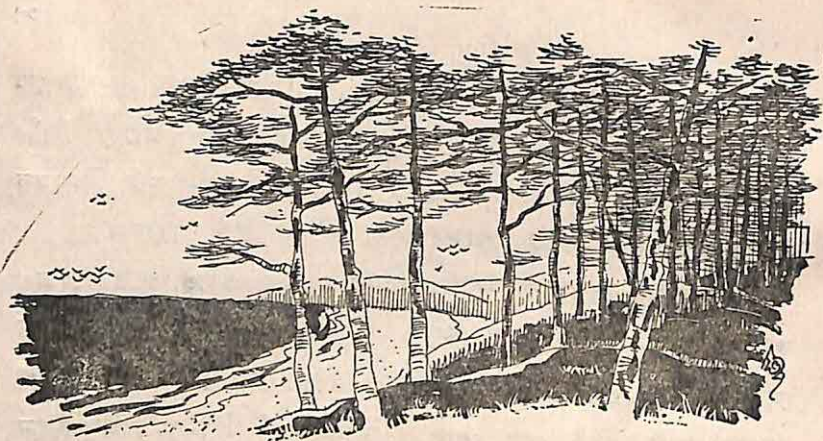
৫

পরদিন খুব ভোরে দীঘা আবার প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠল। রাতের অন্ধকার থেকেই দলে-দলে লোক এলো সী-বীচে সূর্যোদয় দেখবে বলে। চারদিকে শাল কোট ও সোয়েটারের মেলা। সর্বত্রই চা ও কফির লোভনীয় আয়োজন। সাগর সৈকতে নুলিয়াদের মাছ ধরা। সে দেখবার মতো দৃশ্য। কিন্তু তবুও গত সন্ধ্যায় এই মনোরম পর্যটন কেন্দ্রে বাপ্পার অন্তর্ধান রহস্য দীঘা সৈকতে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করলে। তাইতো! কী হ'ল! কোথায় গেল ছেলেটা? দুর্ঘটনা যে কোন সময়ে ঘটতে পারে। তাই কিছু ঘটে গেলে মানুষ সন্ত্রস্ত হয় বৈকি। সেই নিয়েই আলোচনা সবার মুখে।

নানা লোক নানা কথা বলাবলি করতে লাগল। কেউ বলল, ছেলেটাকে নিশ্চয়ই কেউ গুম্ করেছে। কেউ বা অন্যরকম আশংকা করল। বলল, পুলিশের ছেলে তো। হয়তো কারো না কারো রাগ আছে ওর বাবার ওপর। তাই দিয়েছে ছেলেটাকে শেষ করে। কিন্তু তাই যদি হবে, অর্থাৎ গুম্ই যদি করে থাকে ছেলেটা আস্ত আছে তো? আর মেরে যদি ফেলে তাহলেই বা ডেডবডি কই? কেউ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে লুকিয়ে রাখলে এক্ষেত্রে যা হয় অর্থাৎ অসম্ভব একটা মুক্তিপণ চেয়ে নিশ্চয়ই কোন চিঠি দিত। কিন্তু তাও কেউ করেনি। তবে কি একা একা সমুদ্রে নামতে গিয়ে হাঙড়ের পেটে

গেছে ? নাহলে গেল কোথায় ? কোথায় গেল ছেলেটা ?

যাই হোক। অনেকে অনেক মন্তব্যই করল। কিন্তু আসল কথা যে কী, তা কেউ কল্পনাও করতে পারল না।

দীঘার পুলিশ চেষ্টার কোন কসুর করল না। চারদিক তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও আবিষ্কার করতে পারল না বাপ্পাকে। যেখানে যত পোড়ো বাড়ি ছিল, অস্থান কুস্থান ছিল, সর্বত্র ঢুঁ মেরে দেখল। লঞ্চে করে সমুদ্র তোলপাড় করল। কিন্তু না। কোথাও নেই বাপ্পা।

অবশেষে সকলেই এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ছেলেটাকে নিশ্চয়ই কেউ চুরি করে ভিন্ন রাজ্যে নিয়ে গেছে। তবুও বাপ্পার বাবা অসমঞ্জবাবু একজন ঝানু গোয়েন্দা। স্থির সিদ্ধান্তে এসেও তিনি হাল ছাড়লেন না। সূত্র সন্ধানের আশায় এখানকার পুলিশ সঙ্গে নিয়ে নিজেই তদন্ত সুরু করলেন।

প্রথমেই বাঁদিকের সী বীচ ধরে এগিয়ে চললেন মোহনার দিকে। ছেলেটা মোহনা দেখতে চেয়েছিল। একা একা সেখানে যেতে গিয়ে কোন বিপদে পড়েনি তো ? কে জানে ? চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তিনি এগিয়ে চললেন।

সোজা রাস্তা ধরে বালিয়াড়ীর কোল ঘেঁসে এগোতে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। এই তো! এই তো পাওয়া গেছে বাপ্পার রিস্ট ওয়াচটা। তাহ'লে তো বাপ্পা সমুদ্রের শিকার হয়নি। বাপ্পা তো তাহলে এদিকে এসেছিল। এবং এদিকে এসেই সে বিপদে পড়েছে। অর্থাৎ সে যে কোন দুষ্ট লোকের চক্রান্তের বলি হয়েছে তা বুঝতে একটুও দেরি হল না তাঁর।

তিনি বার বার সন্ধানী দৃষ্টিতে চারদিকের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করতে লাগলেন। আরো কিছু সূত্র পাবার আশায় উৎসুক হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু না। এখানে পায়ের ছাপ এত বেশি যে সব গোলমাল হয়ে গেল।

এই খানেই বালিয়াড়ীর মধ্যে একটা ধ্বসের চিহ্নও দেখালেন অসমঞ্জবাবু। আর ঠিক তার নিচেই ঐ রিস্ট্ ওয়াচ। অর্থাৎ বোঝা

গেল ঐ বালিয়াড়ীর ওপর থেকে যেভাবেই হোক হড়্‌কে পড়ে গেছে ও।

অসমঞ্জবাবু ভাবলেন, আচ্ছা এমনও তো হতে পারে বাপ্পা কোন কারণে ওখান থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় কারো আশ্রয়ে আছে? অবশ্য একথা মনে এলেও এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পেলেন না। কেননা তাই যদি হবে, তাহ'লে এতক্ষণে তারা তো নিশ্চয়ই জানাবে পুলিশকে। অথবা হাসপাতালে ভর্তি করবে।

অসমঞ্জবাবুর মাথার ভেতর ঝিম্ ঝিম করতে লাগল।

তাহ'লে সত্যিই কি তাঁর ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে কেউ নিয়ে গেছে ছেলেটাকে? তাঁর ঐ একমাত্র সন্তান। কত আদর যত্নে তাকে তিনি বড় করে তুলছেন। কত স্বপ্ন ছিল ঐ ছেলেটিকে ঘিরে। সব জাল যেন ছিঁড়ে গেল। এতটুকু আঘাত যে সহ্য করতে পারে না, দুর্বৃত্তরা হয়ত তার ওপর আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছে। আহা রে। বাপ্পা কি পারবে অত নির্যাতন সহ্য করতে? হয়তো মরেই যাবে ছেলেটা। অসমঞ্জবাবুর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। রুমালের খুঁট দিয়ে সে জল মুছে নিলেন তিনি।

তবুও তিনি বালিয়াড়ী বেয়ে ওপরে উঠে দেখলেন এক জায়গায় কয়েকটি আধপোড়া সিগারেট পড়ে আছে। তার পাশেই অপ্রত্যাশিত ভাবে আর একটি সূত্র। অর্থাৎ একটি রুমাল। মানে এটা পেতে কেউ এখানে বসে ছিল কিন্তু উঠে যাবার সময় নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। এ নিশ্চয়ই কোন ভদ্রলোকের রুমাল নয়। নাহলে এত জায়গা থাকতে এইখানে এসে কোন ভালোমানুষ বসতে যাবে? যাই হোক, রুমালটা কাজে লাগবে।

তারপর আরো একটু এগোতেই দেখতে পেলেন একটি গাছের গায়ে আঁচড় কাটা বাপ্পার নাম।

অসমঞ্জবাবুর বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল।

বাপ্পার এখানে আসার সব রকম অস্তিত্বই তো আছে। শুধু বাপ্পাই নেই। এখানকার আকাশ-বাতাস, ঝাউবন, সমুদ্র সবাই

সব কিছুই দেখেছে। কিন্তু এরা তো মূক। তাই কিছু বলতে পারছে না। শুধু অসহায়ভাবে তার সেই পদচিহ্নর স্মৃতিটুকু বুকে করে ধরে রেখেছে! আর এঁকে রাখা স্বাক্ষরকে চোখের সামনে মেলে ধরেছে।

অসমঞ্জবাবু আরো এগিয়ে চললেন। ঐ দেখা যায় মোহনা। বাপ্পা ওখানেও গিয়েছিল নিশ্চয়ই। লাইকানি নদী যেখানে সাগরের সঙ্গে মিশেছে, সেইখানে এসে থামলেন। মোহনায় তখন নুলিয়া ও জেলেদের ভীড়। তারা বলল, আমরা তো কিছুই বলতে পারব না বাবু। কাল সন্ধ্যায় যারা এখানে ছিল তারা এখন সাগরে। আর আমরা যারা সাগরে ছিলাম আজ এই সকালে আমরা লাইকানির চরে।

অবশেষে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর একজন বুড়ো মাঝি বলল—'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কাল ঠিক ভর সন্ধ্যেবেলায় একটি ছেলে এখানে এসেছিল। তবে কিনা তাকে তো এখানে বেশিক্ষণ থাকতে দেওয়া হয়নি। বুঝিয়ে বাঝিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

অসমঞ্জবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। নাঃ। আর কোন সূত্র নেই। এখান থেকে ফিরে যাবার সময়ই বাপ্পা দুর্বৃত্তদের নজরে পড়ে। তারপর ওর নিয়তি ওকে যেখানে নিয়ে গেছে সেখানেই গেছে ও!
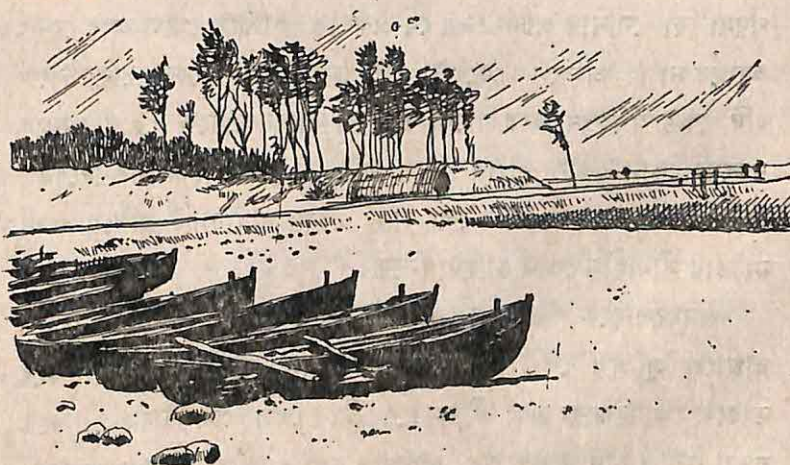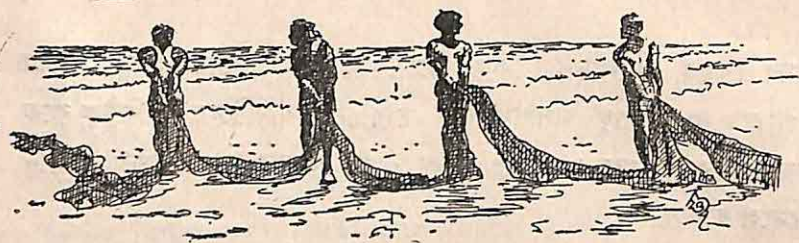
৬

এদিকে স্থানীয় পুলিশ তো বিভিন্ন সূত্র ধরে চারিদিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে তদন্ত সুরু করল। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে চলল জোর তল্লাসী। অসমঞ্জবাবু নিজে একজন গোয়েন্দা হয়েও ঘটনাটা কিভাবে কী ঘটে গেল, তার বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারলেন না। অবশ্য দোষও নেই। একদিকে স্ত্রীর ঐ অবস্থা অন্যদিকে নিজেও পুত্রশোকাতুর। যত বেশি ভাবেন, যত বেশি চিন্তা করেন, ততই হতাশ হন। সাধারণ বুদ্ধিমত্তাও যেন হারিয়ে ফেলেন মাঝে-মাঝে।

বাপ্পার অন্তর্ধান রহস্য তাকে একদিকে যেমন ভাবিয়ে তুলল, অপরদিকে তেমনি বিস্মিতও করল। কেননা এইসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা হয়, বাপ্পার বেলায় তা হ'ল না। ছেলেটাকে নিয়ে যাবার পর এতখানি সময় পার হয়ে গেল অথচ ছেলেটার মুক্তিপণ দাবী করে কেউ কোন চাপ সৃষ্টি করল না। বিশেষ করে ছেলেটা যখন টাকা-পয়সা বা সোনার গয়না নয় যে একবার হারিয়ে গেলে আর ফেরৎ আসবে না। আসলে ছেলেটা তো ছেলেই। কাজেই ছেলেটাকে যদি কেউ অপহরণ করে থাকে, তাহ'লে তাকে আটকে রেখে অসম্ভব রকমের কোন একটা প্রস্তাব নিয়ে কেউ না কেউ চিঠিপত্তর দেবেই। কিন্তু না। এক্ষেত্রে তা হ'লো না। কোন দাবীদারই এগিয়ে এলো না তার সীমাহীন কোন চাহিদা নিয়ে।

অসমঞ্জবাবুকে এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে বেশি পীড়া দিল। বাপ্পাকে লুকিয়ে কেউ যদি তার কোন দাবী পেশ না করে তাহলে কি উদ্দেশ্যে এবং কী কারণে নিয়ে গেল ছেলেটাকে? ওকে হত্যা করাও যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলেও তো এতক্ষণে ওর লাশ কোথাও

না কোথাও পাওয়া যেত। এইসব নানা রকমের চিন্তা-ভাবনার ঢেউ মাথার মধ্যে খেলতে লাগল অসমঞ্জবাবুর। কিন্তু তবুও তিনি নিজে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না।

অসমঞ্জবাবু পুলিশের লোক হয়েও মনে-মনে ঠিক করেছিলেন বাপ্পার মুক্তিপণ চেয়ে কেউ যদি কোন অসম্ভব রকমের কিছুও চেয়ে বসে, তবে তা দিতেও তিনি পিছপা হবেন না, বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করে দুর্বৃত্তদের হাতে যথাসর্বস্ব তুলে দিতেও তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। কিন্তু কই? সেরকম সম্ভাবনা নিয়েও কেউ তো এলো না? তবে কি ছেলেটা আদৌ অপহৃত হয় নি? তবে কি থানা-পুলিশ নিয়ে বড্ড বেশি ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে গেছে বলে কেউ আসতে চাইছে না? কিন্তু আসবে তো উড়ো চিঠি। তাই বা আসছে না কেন?

ভাবতে-ভাবতে পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

অসমঞ্জবাবুর চোখ দু'টি ভরে উঠল জলে। কত রকম ভাবতে লাগলেন তিনি। মনে-মনে ঠিক করলেন, একবার—শুধু একবার যদি বাপ্পাকে ফিরে পান, তাহলে পুলিশের চাকরিতে আর নয়। তাঁর তো টাকা-পয়সার অভাব নেই। পৈত্রিক সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্কের টাকা যা আছে, তাতে চাকরি না করলেও চলে যাবে তাঁর। দেওঘর, গিরিডি কিংবা ঘাটশিলার কোন নির্জন পরিবেশে গিয়ে শান্তিতে বসবাস করবেন। কলকাতার এই বিষাক্ত পরিবেশে আর নয়। পশ্চিমবঙ্গেও নয় পুলিশের চাকরিতে তো নয়ই। কিন্তু এ সবই অবাস্তব চিন্তা। আসলে যার জন্য এত চিন্তা-ভাবনা সে কই? কোথায় বাপ্পা? বাপ্পাকে কি আর কখনো ফিরে পাবেন? সে কি সত্যি বেঁচে আছে?

দূরাগত মোটর বাইকের শব্দে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল অসমঞ্জবাবুর এখানকার একজন দুঁদে পুলিশ অফিসার মিঃ কাঞ্জিলাল এসে হাজির হলেন। তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত মনে হ'ল।

অসমঞ্জবাবু আশান্বিত হয়ে বললেন—কোন খবর আছে?

—আপনাকে এখুনি একবার থানায় যেতে হবে স্যার।

—ফর হোয়াই ? কোন হদিশ-টদিশ পাওয়া গেল ?

—একবার থানায় আস্থন।

অসমঞ্জবাবু অশুভ চিন্তায় থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন—কেন ? ছেলেটার ডেড্‌বডি দেখতে ?

—না-না। সে সব কিছু নয়। তবে সন্দেহভাজন একজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। এবং এ লোকটা এক দাগী আসামী।

অসমঞ্জবাবু হতাশ হয়ে বললেন —তাতে আর লাভ কি ? ওকে মোচড় দিলে কি আমার ছেলের খোঁজ পাওয়া যাবে ?

—লাভ আছে বৈকি। আমার মনে হয় একে মোচড় দিলেও কিছু বেরোবে। কেননা এ সেই রুমালের মালিক। ইতিপূর্বে দু'একটা ছেলে চুরির কেসেও ও জড়িত ছিল। এবং ও একজন জেল পলাতক কয়েদী।

অসমঞ্জবাবু সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন—কী বললেন ? এ সেই রুমালের মালিক ? মানে, যে রুমালটা আমি সকালে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম ?

—হ্যাঁ।

—কি করে ধরলেন ওকে ?

—ধরেছি। ওর এক সঙ্গীও আছে। তাকেও ধরবার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না।

অসমঞ্জবাবুর একটু আগের স্নায়বিক দুর্বলতা কেটে গেল। এখন উনি সেই পুলিশ। তাঁর পুলিশি রক্ত টগবগিয়ে উঠল। শিরদাঁড়া টান-টান করে বললেন—কান যখন হাতের মুঠোয়, মাথাও তখন নাগালের মধ্যে। মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো ওর। চলুন তো। কিন্তু আমার ছেলের ব্যাপারে কিছু বলেছে কি ?

—ঐ জন্যেই তো ছুটে এলাম আপনার কাছে। ও বলছে যা বলবার তা নাকি আপনাকেই বলবে।

—তার মানে ও কিছু জানে।

সুজাতা দেবী তখনো শয্যাশায়ী ছিলেন। বললেন—দেখো ওকে

যেন আগেই তোমরা মার-ধোর করে বসো না। ও যদি আমার বাপ্পার কোন খোঁজখবর দিতে পারে, তাহলে ওকে কিচ্ছু বলো না তুমি লক্ষ্মীটি এবারের মতো ওকে ক্ষমা করো।

অসমঞ্জবাবু সঙ্গে-সঙ্গে তৈরী হয়ে মিঃ কাঞ্জিলালের বাইকেই থানায় এসে হাজির হলেন।

ধৃত বন্দী যুবকের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন অসমঞ্জবাবু। সর্বনাশ! ছেলেটা এদের খপ্পরে পড়েছে নাকি? বহুদিনের পুরনো এবং কুখ্যাত এক দাগী আসামী। কোন এক কিশোরী হত্যা মামলায় অ্যারেষ্ট হয়েছিল লোকটা। বিচারে দশ বছরের জেল হয়। জেলে গিয়েও মাস ছয়েকের মধ্যে সেখানকার রক্ষীকে মেরে পলাতক হয় ও। ওর এক বন্ধুও আছে। তাকেও ধরেছিলেন। উপযুক্ত সব রকম প্রমাণ লোপ পাওয়ায় সে যাত্রায় বেঁচে গেছল লোকটা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে একটা রাহাজানি কেসে ধরা পড়ে ঐ একই জেলে দুজনে মিলিত হয়। এর পরই জেল পালানোর ঐ ঘটনা ঘটে।

অসমঞ্জবাবু ধৃতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—কিরে! চিনতে পারিস?

ধৃত লোকটি কোন রকমে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গী করল। তারপর বলল—পারি বৈকি।

—শেষকালে আমার ঘরে হাত দিতে এসেছিস তুই? সাহস তো কম নয়।

লোকটি নীরব।

—তোর নামটা কিন্তু ভুলে গেছি।

—আমার নাম রূপেন।

— ার সেই বন্ধুটা।

—ওর নাম সুখেন।

—হুঁ। তা ছেলেটাকে কোথায় রেখেছিস?

—ভগবান যেখানে রেখেছেন। আমরা কোথাও রাখিনি তাকে। অসমঞ্জবাবু জুতো শুদ্ধু পায়ে ওর পেটে সজোরে একটা লাথি

মারলেন।

লোকটার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল। তাই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

অসমঞ্জবাবু ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে দাঁড় করালেন ওকে—বল শিগগির। নাহলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো একেবারে।

—আপনি বিশ্বাস করুণ স্যার। সত্যি বলছি। বাবা চন্দনেশ্বরের দিব্যি আমি কিছুই জানি না।

—কিছুই জানিস না যদি তো আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিস কেন? জানিস না বুঝি আমরা দু'জনে মুখোমুখি হলে এই রকম ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঘটবে? বলেই শক্ত রুলের বাড়ি এক ঘা।

রূপেন যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে বলল—আপনি বিশ্বাস করবেন না জানি, তবুও বলি আপনার ছেলেকে আমরা ধরিনি। কেনই বা ধরব? তার ওপরে তো আমাদের কোন রাগ নেই।

—নাই বা রইল। আমার ওপরে তো আছে?

—তা আছে। তবে এই মুহূর্তে আর নেই।

—এমন ঝাড় খাওয়ার পরেও না?

—না। আসলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি অন্য কারনে। আপনার ছেলের ব্যাপারে একটু কথা বলতে এসেছিলাম।

—আমার ছেলের ব্যাপারে? কি কথা।

—আপনার ছেলেটাকে আমরা দেখেছিলাম।

—কখন?

—কাল সন্ধ্যায়। সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন। সেই অন্ধকারে। ও মোহনার দিক থেকে আসছিল। এমন সময় আমাদের সঙ্গে দেখা। আমরা দু'জনেই ছিলাম তখন। মানে আমার বন্ধু সুখেনও ছিল। ও-ই প্রস্তাব দিয়েছিল ছেলেটাকে গুম্ করবার। ও চেয়েছিল ওকে হত্যা করতে। এবং ওকে হত্যা করে আপনার ওপর প্রতিশোধ নিতে। যদিও আমি তাতে রাজি হইনি এবং সে কাজ ওকে করতেও দিতাম না। তবুও আমরা যখন এই সব

আলোচনা করছি তেমন সময় হঠাৎ দেখি ছেলেটা নেই।

—সেকি !

—সম্ভবতঃ আমাদের কথাবার্তা ও শুনতে পায় এবং তাতেই ভয় পেয়ে পালায়। ওকে পালাতে দেখে আমরাও ধরবার জন্য ছুটলাম। এমন সময় হঠাৎ কয়েকটা কুকুর ওকে তাড়া করে।

—অসমঞ্জবাবু শশঙ্কিত হয়ে বললেন—সে কি ! কুকুরগুলো ওকে আঁচড়ে কামড়ে দেয় নি তো ?

—মনে হয় না। তাহ'লে ছেলেটা চেঁচাত। যাই হোক, আমরা যখন ছেলেটাকে কুকুরের হাত থেকে বাঁচাব বলে ছুটে গেলাম তখন দেখি ছেলেটা ম্যাজিকের মত হাওয়া হয়ে গেল। পরক্ষণেই একটা মোটর বাইকের শব্দ। আমরা বুঝলাম কেউ ওকে নিয়ে গেল।

অসমঞ্জবাবু বললেন—তাহ'লে কাল রাতেই তোরা এসে খবর দিস্ নি কেন আমাকে ?

—কেন দেবো ? আমরা যখন অপহরণ করিনি তখন কেন আমরা ঐ কিড্ন্যাপিং কেসে নিজেদের জড়াতে যাব ? আমরা কুখ্যাত জেল পলাতক কয়েদী। দাগী আসামী আমরা। আমরা কিছু বললেও কি আপনারা বিশ্বাস করতেন ? পরে অবশ্য ভেবে দেখলাম কাজটা আমরা ঠিক করিনি !

অসমঞ্জবাবু দু'হাতে নিজের মাথার চুলগুলো মুঠো করে বললেন —ওঃফ্। আজ যদি তুই ধরা না পড়তিস, তাহ'লে এসব কথা তো জানতেই পারতাম না আমি।

—ধরা আমি পড়িনি স্যার কাল সারা রাত ধরে দু' বন্ধুতে যুক্তি করে আজ আমি নিজেই এসে ধরা দিয়েছি। নাহলে আমাদের ধরবে কে ? এই সব পুলিশ ?

—তুই নিজে এসে ধরা দিয়েছিস ?

—হ্যাঁ। আপনাদের কাছে ভালো প্রস্তাব নিয়ে আসারও পুরস্কার তো হাতে-নাতে পেয়ে গেলাম। থানার কাছাকাছি যেই না এসেছি অমনি আপনাদের লোকেরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতে হাত কড়া লাগিয়ে দিল। সবাই ধরে নিল আমি বোধ হয় ছেলেটাকে আটকে রেখে তার মুক্তিপণ চাইতে এসেছি। কিন্তু এটুকু বুদ্ধি কারো ঘটে নেই যে মুক্তিপণ চাইতে আমি থানায় আসব কেন ?

অসমঞ্জবাবু বললেন—তুই তাহ'লে কি জন্যে এসেছিস ?

—যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন তাহ'লে বলি। আপনার ছেলের চুরির ব্যাপারে আমি আপনাকে একটু সাহায্য করতে চাই। এবং সেই জন্যেই এখানে এসেছি। তবে একটু ভুল হ'লো এখানে না

এসে যদি আপনার হোটেলটা খোঁজ করে সেখানে দেখা করতাম তাহ'লে এই সব পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন হতাম না। যাক। যে জন্যে আসা সেই কথাই বলি। আমরা দু বন্ধুই এখন খুব একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে আছি।

—কেন, কী হ'লো ?

—আমরা যে কোন কারণেই হোক আমাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছি এবং দল থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমাদের মতো ক্রিমিন্যাল দল থেকে বেরিয়ে এলে আমাদের পরিণাম কী হতে পারে, তা অনুমান করতে পারছেন নিশ্চয়ই ?

—ওরা তোদের মারবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। এই তো ?

—হ্যাঁ! এবং আমরাও ওদের মারবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছি। কাল রাতে ঐ নির্জনে ঐ ব্যাপারেই আলোচনা করছিলাম আমরা। এমন সময় আপনার ছেলের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। স্যার, আমাদের চোখের সামনে থেকে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে এমন ক্রিমিন্যাল এ অঞ্চলে নেই। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের গতিবিধির ওপর কেউ নজর রাখছিল এবং আমাদের জালে জড়াবে বলে বা অন্য কোন মতলবে ছেলেটাকে ঐ নজরদাররাই চুরি করে এটা আমাদেরই মূল কেন্দ্রের কাজ।

অসমঞ্জবাবু বললেন—যদি তাই হয়, তাহ'লে তোরা কি পারবি আমার ছেলেকে ওদের হাত থেকে বার করে আনতে ?

—আপনার সাহায্য পেলে পারব। স্যার বিশ্বাস করুন, এই প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ির খেলা আর ভালো লাগছে না। আমাদের হয়েছে জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ। একদিকে পুলিশের তাড়া, অন্যদিকে আততায়ীর বুলেট। এইভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ আছে কিছু ? আমার বন্ধু সুখেন, সে তার একমাত্র পুত্রকে হারানোর জন্য আপনাকেই নিমিত্ত বলে মনে করে। কিন্তু পুত্রশোক যে কি জিনিস তা তো সে জানে। তাই অনেক বুঝিয়ে তারও মনের পরিবর্তন ঘটিয়েছি। সেও আপনার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়

না। মোট কথা এখন আমরা দু'জনেই আইনের আওতায় আসতে চাই। আপনি আমাদের জেলে ঢোকান, প্রাণে মারুন, যা ইচ্ছে করুন শুধু যারা আমাদের এই পথে নিয়ে এসেছে দুনিয়া থেকে বরাবরের জন্যে চলে যাবার আগে তাদের সঙ্গে লড়বার একটা সুযোগ করে দিন। আশা করি আপনার ছেলে আমরাই উদ্ধার করতে পারব।

—তোমাদের কী দৃঢ় বিশ্বাস ওরাই এ কাজ করেছে?

—হ্যাঁ।

—বেশ। আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করলাম। বলে একজন সার্জেন্টকে বললেন—লোকটার হাতকড়া খুলে দিতে বলুন তো।

একজন এসে বন্ধনমুক্ত করল রূপেনকে।

রূপেণ অসমঞ্জবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল—একদিন আমরাও ভদ্র ঘরের ছেলে ছিলাম স্যার। কর্মদোষে এবং ভাগ্যদোষে আজ ক্রিমিন্যাল হয়েছি। যাই হোক। আমরা কসম খেয়েছি আর কখনো খারাপ কাজ করব না। এতে অবশ্য আইনের হাত থেকে আমরা রক্ষা পাবো না। তবুও ভালো হবার চেষ্টা করে আগেকার পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করব। তবে আমাদের শত্রুদের বিনাশ ঘটাবোই। ওদের যেখানে যা ঘাঁটি আছে সব আপনাদের চিনিয়ে দেবো। ওদের মর্জিমাফিক আর কোন খারাপ কাজ করতে আমরা চাইনি বলেই ওদের দলচ্যুত হয়েছি। আর খারাপ কাজ করব না। বলেই দল ছেড়ে বেরিয়ে এসেও পাল্টা দল আর গড়ি নি। শুধু ওদের শেষ করে নিজেরাই গিয়ে জেলে ঢুকব এই প্রতিজ্ঞা করেছি।

অসমঞ্জবাবু একটা চেয়ারে বসে বারবার দু'হাতে মাথার চুলগুলো অকারনেই মুঠো করে ধরতে লাগলেন।

রূপেন বলল—অত ভেঙে পড়বেন না স্যার। আমরা আছি আপনার পিছনে। আমাদের আগেকার অপরাধের জন্য যা শাস্তি হয় দেবেন। মাথা পেতে নেবো। এখন শুধু আপনার ছেলেকে উদ্ধার করে আনার মতো একটা ভালো কাজের সুযোগ করে দিন।

—তোমার ঐ একই কথা বাব-বার বলার আর দরকার নেই।

এখন কি ভাবে কী করতে চাও তাই বলো। কেননা আমার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তবে না বুঝে তোমাকে মার ধোর করেছি বলে দুঃখিত।

—হ্যাঁ। আমরা কি ভাবে কি করতে চাই তা সবই আপনাকে বলব। আমার বন্ধু রূপেন একটি গোপন স্থানে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। আমি আগে একবার তার কাছে যাব। তারপর সন্ধ্যের সময় চলে যাব আপনার হোটেলে। আপনি কোন হোটেলে আছেন স্যার?

—হোটেল রাম নিবাস।

—ঠিক আছে। আপনার সঙ্গে যোগাযোগগুলো আমরা খুবই গোপনে করতে চাই। যাতে ওরা বুঝতে না পারে যে আমরা আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করছি।

অসমঞ্জবাবু বললেন—যারা তোমাদের এত বেশি নজরে রাখছে তারা কি মনে করো এত কাঁচা লোক যে তুমি থানায় এসে নিজেই ধরা দিয়েছ, অথবা ধরা পড়েছ এ খবর তারা পায় নি? বিশেষ করে জেনে রেখো তুমি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা সতর্ক হয়ে গেছে। কেননা ওরা জানে তোমরা দু' বন্ধুই এখন ওদের শত্রু। অর্থাৎ তোমরা ধরা পড়লে স্বেচ্ছাতেই ওদের সব কথা পুলিশকে বলে দেবে। তবু বলছ যখন তখন যতটা সাবধান হওয়া দরকার ততটা সাবধান হয়েই কাজ করা যাবে।

—আমি এখন একবার সুখেনের কাছে যেতে চাই। ঠিক সন্ধ্যের সময় দেখা করব আপনার সঙ্গে।

– করো। ছেলে উদ্ধার হোক না হোক ওদের গ্যাংটাকে তো ধরতে পারব। এটাও আমার কর্তব্য।

রূপেন চলে গেলে অন্যান্য পুলিশের লোকেরা বলল—একি করলেন স্যার! একটা বোর্ণ ক্রিমিন্যালকে আপনি এইভাবে ছেড়ে দিলেন? ও তো রীতিমতো নক্সা মেরে বেরিয়ে গেল? ওকি সন্ধ্যের পর আপনার সঙ্গে সত্যি-সত্যিই দেখা করবে ভেবেছেন?

—করতেও তো পারে। দেখাই যাক না একবার একটু সুযোগ

দিয়ে। বিশেষ করে ও যখন নিজেই এসেছিল দেখা করতে।

অসমঞ্জবাবু আর বসলেন না। থানা থেকে বেরিয়ে আবার হোটেলে ফিরে এলেন। কিন্তু একি! দরজায় তালা দেওয়া কেন?

বেয়ারা বলল—মা তো একটু আগেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মোটরে চেপে চলে গেলেন।

—কোথায়?

—খোকাবাবুকে আনতে।

—তার মানে?

—কেন বাবু, শুনলাম যে খোকাবাবুকে পাওয়া গেছে। আপনিই তো থানা থেকে লোক দিয়ে গাড়ি পাঠিয়েছিলেন!

—সেকি!

—হ্যাঁ। উনি তো তাই বললেন।

অসমঞ্জবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এই মুহূর্তে নিজেকে তাঁর অত্যন্ত বোকা এবং অসহায় বলে মনে হ'লো!

৭

'চিৎ ইয়া পৎ···হু র্ র্ র্ ইয়াঃ। খোদা যিসকো দেগা উসকো ছপ্পর ভরকে দেগা, যিসকো নেহি দেগা উসকো রোনা মাৎ। লা ইলাহা ইল্লিল্লা ইল্লা রসুল্লাহা।' বলেই আর্চ করার ভঙ্গিতে একটা ডিগবাজি খেয়ে শিরদাঁড়া টান করে বল্লমটা ওপরে তুলে আবার চিৎকার করে উঠল – 'আল্লা হো আকবর্ র্ র্। খোদা বঢ়ী মেহেরবান।'

দীঘা সৈকতে ভ্রাম্যমাণ জনতার উৎসুক চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে আবার বলল, 'যো চলা যায়গা, ও কভী নেহি আপস আয়গা। যো আয়গা ও জীয়েগা নেহি। জীয়েগা তো জিন্দেগীভর জীয়েগা, নেহি জীয়েগা তো ক্যা কিয়েগা ? দুর্গামায়ী বাচাকা রাখ্‌কা দুর্গামায়ী বাচাকা রাখ্‌কা। সীতারাম ঝটপট। যার কাছে যা কিছু আছে চটপট দিয়ে দিন। সীতারাম ঝটপট কব্ তক্ খাড়া রহেগা ?' বলেই হাত পেতে ভীড়ের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল।

লোকটার যে কি জাত, তা কেউ জানে না। হিন্দু না মুসলিম না খ্রীষ্টান, তাও জানে না কেউ। কী ওর ভাষা তাও তো রহস্যময়। মুখে বলবে সীতারাম ঝটপট। নাম জিজ্ঞেস করলে বলবে, আমার নাম অ্যান্টনি। শ্রীমান অ্যান্টনি ধিড়িঙ্গী। বোঝো। একটা আধবুড়ো লোক নামের আগে শ্রীমান বলবে, সারনেম বলবে ধিড়িঙ্গী। ধিড়িঙ্গী কি কারো পদবী হয় ? কে জানে ? কেউ বলে ছিটিয়াল,

কেউ বলে পাগল, কেউ বহুরূপী, কেউ বলে গুপ্তচর। আবার কেউ বা বলে বদের ধাড়ি। বেশটি করে ধরে চাব্‌কালে তবে গায়ের রাগ যায়। কিন্তু যে যাই বলুক ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে এই লোকটি অত্যন্ত আদরের। ওকে আসতে দেখলে ছোটদের আনন্দের আর অবধি থাকে না। লোকটি হাত পেতে পয়সা নিতে-নিতে ভীড় ঠেলে বাজারের দিকে এগিয়ে চলল।

এমন সময় কে যেন একজন ভীড়ের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলল—হেই ব্রেনলেশ, সীতারাম অ্যান্টনি! এই পাগলা! হোয়ার আর ইউ গোয়িং?

লোকটি ঘুরে তাকিয়েই রাগে থর-থর করে কাঁপতে লাগল। ক্রুদ্ধ স্বরে বলল—

আমার নাম অ্যান্টনি ধিড়িঙ্গী
নইকো ট্যাঁস্ নই ফিরিঙ্গী,
যে আমায় পাগল বলবে—
তার কথায় কি দুনিয়া চলবে?
কিসিসে দোস্তি কভী তো নয়
ইউ আর অল শূকর-তনয়।

যে লোকটি ভীড়ের ভেতর থেকে অ্যান্টনিকে পাগলা বলে ডেকেছিল এখন গালাগালি খেয়ে লোকটি ছুটে এসে আক্রমণ করল ওকে। অ্যান্টনির গালে একটা চড় মেরে বলল—তুই আমায় গালাগালি দিলি কেন?

অ্যান্টনিও আক্রমণের জবাবে লোকটিকে পাল্টা আক্রমণ করে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলল। এবার চলল দুজনের ধুলোয় লুটোপুটি। লোকটির চোয়াল এক হাতে শক্ত করে টিপে অ্যান্টনি বলল—তোদের যার যা ইচ্ছে সে তাই বলে যাবি আর আমি মুখ বুঁজে সহ্য করে যাবো দিনের পর দিন তাই না?

গোলমাল আরো গড়াত। স্থানীয় কিছু লোকজন এসে ছাড়িয়ে দিল তাই রক্ষে। যে লোকটিকে অ্যান্টনি ধরাশায়ী করেছিল সে

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে অ্যান্টনিকে গালাগালি দিতে-দিতে চলে গেল।

অ্যান্টনিও হাতের বল্লমটা একবার শূন্যে নিক্ষেপ করে পরক্ষণেই সেটাকে লুফে নিয়ে সুর করে বলল—ল্যাংড়া-খোঁড়া নাচার বাবা মুঝে এক পয়সা দো···।

অসমঞ্জবাবুর এমন দুঃখের দিনেও হাসি পেল। এতক্ষণ স্ত্রীর খোঁজে পথে বেরিয়ে লোকটির কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন। এবার সঙ্গের সাদা পোষাকের পুলিশ অফিসারকে বললেন—এ লোকটি কে বলুন তো?

—তা জানি না। তবে লোকটি অনেকদিন ধরেই এখানে আছে।

—কতদিন?

—এই ধরুন বছর পনেরো।

—থাকে কোথায়।

—এর কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। আজ এখানে কাল ওখানে পরশু সেখানে। ভিক্ষে করে যা পয়সা পায় তাতেই কোনরকমে দিন কাটায়।

—লোকটাকে একটু নজরে রাখবেন।

—কেন স্যার ও আমাদের পরিচিত। কোন সন্দেহভাজন কেউ নয়। দীঘা ছেড়ে বড় একটা যায়ও না কোথাও।

—ঐ লোকটাকে চিৎ করে ফেলে ওর বুকে ওঠার টেকনিক দেখলেন? অসীম শক্তি ওর দেহে। লক্ষণ ভালো বুঝছি না। এইসব পাগল-ছাগল মার্কা লোকেরাই অনেক সময় বিভিন্ন দলের হয়ে কাজ করে! তাই বলছি ওর গতিবিধির ওপর একটু নজর রাখবেন।

অসমঞ্জবাবু কথা বলতে-বলতেই একটা সিগারেট ধরালেন। এমন সময় দুজন সার্জেণ্ট এসে নমস্কার জানিয়ে বলল—না স্যার। কোন হদিশই পাওয়া গেল না। তবে আপনার হোটেলের বেয়ারা যে রকম গাড়ির কথা বলছে ঐরকম একটি গাড়িকেঅবশ্য কিয়াগেড়িয়া

চেক পোস্টে দেখা গেছে। সেটি এখন সীমান্তের ওপারে। উড়িষ্যার পুলিশকে আমরা নজর রাখতে বলেছি। তবে ওরা যদি একটু তৎপর হয় তো একটা বিহিত হতে পারে। কেননা ঐ বিশাল রাজ্যের কোথায় কোন পাহাড়ে-জঙ্গলে ওনাকে গুম্ করে রাখবে ওরা, তা কেই বা বলতে পারে ?

অসমঞ্জবাবু বললেন—হুম্। ওদের আর কখনো ফিরে পাবো এমন আশা আমি মনের মধ্যে রাখিনা, তবুও বলি এখানকার সমস্ত নামকরা ক্রিমিন্যালগুলোকে এক-এক করে অ্যারেষ্ট করুন এবং তাদের মুখ থেকে কথা বার করার চেষ্টা করুন।

—সে কাজ অনেক আগেই সুরু করে দিয়েছি আমরা। এবং কয়েকজনকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদও চলছে।

অসমঞ্জবাবুর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। একসঙ্গে স্ত্রী-পুত্র দুজনকেই হারালেন তিনি। সুজাতাদেবী যে কার সঙ্গে কোথায় গেলেন বা যেতে পারেন তা কিছুতেই অনুমান করতে পারলেন না। এবং এখনো পর্যন্ত যখন তাঁর ফিরে আসার কোন খবর নেই তখন ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে তাঁকেও অপহরণ করা হয়েছে।

এ খবরও চাপা রইল না। বাতাসের আগে দীঘার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আবার হৈ-হৈ পড়ে গেল চারিদিকে।

এরই মধ্যে সমুদ্রের বুকে সূর্য্যাস্ত হ'ল। অসমঞ্জবাবু সাদা পোষাকের পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়েই আবার হোটেলে ফিরে এলেন। এখন বার-বারই তাঁর মনে হতে লাগল সেই কুখ্যাত গুণ্ডা রূপেনকে ছেড়ে দিয়ে সত্যিই তিনি কোন ভুল করলেন কি না ? এটা কি ওদের কোন নাটকীয় চাল ? দেখাই যাক। লোকটার তো সন্ধ্যের পর আসবার কথা আছে। যদি না আসে তাহলে ধরে নিতে হবে এ ওদেরই কাজ। এবং তখন তাঁর নিজের ভুলের মাশুল নিজেকেই দিতে হবে।

*　　　*　　　*

রূপেন যেরকম কথা দিয়েছিল, ঠিক সেইরকম সময়েই সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েলুকিয়েএলো। অবশ্য ও একা নয়। সঙ্গে সুখেনও।

অসমঞ্জবাবুর তখন উদ্‌ভ্রান্তর মতো অবস্থা। ওদের দু'জনকে দেখেই জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন হাতের কাছে কোন কিছু পেলে তাই ধরে ওঠবার চেষ্টা করে ঠিক সেইভাবেই ওদের দু'জনকে চেপে ধরলেন। দু'জনের দু'টি হাত ধরে বললেন—আমি তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। একমাত্র তোমরাই পারবে আমার স্ত্রী-পুত্রকে উদ্ধার করতে। কেননা তোমরা চিরকাল অসৎ পথে ছিলে। তাই খারাপ লোকেদের গোপন ঘাঁটিগুলো তোমাদের অজানা নয়। তোমরা চারিদিক চুঁড়ে ফেলো। আমি আমার পুলিশ বাহিনী দিয়ে যতদূর পারব সাহায্য করব। তাছাড়া আমি নিজে তো চেষ্টা করবই। যেভাবেই হোক জীবিত অথবা মৃত ওদের উদ্ধার করতেই হবে।

রূপেন বলল—ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় স্যার। কেননা আমাদের ধারণা আপনার ছেলেকে অপহরণ করার উদ্দেশ্য ওদের ছিল না। যে পরিবেশে ছেলেটিকে আমরা দেখেছি বা তার সঙ্গে কথা বলেছি সেই পরিবেশে কুকুরের তাড়া খেয়ে পালাবার সময় হঠাৎ চোখের পলকে ছেলেটাকে গুম করাটা নেহাৎই অঘটন ছাড়া কিছু নয়।

সুখেন বলল—বিশেষ করে ছেলেটি যে বালিয়াড়ীর ঐখানেই আসবে, সেটা তো অপহরণকারীদের আগে থেকে জানবার কথা নয়।

—তা ঠিক। কিন্তু টারগেট যদি না থাকবে তাহ'লে ওরা কিসের স্বার্থে আমার স্ত্রী-পুত্রকে অপহরণ করল? সবচেয়ে আশ্চর্য এই অপহরণের আগে বা পরে কোন ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপার ঘটেনি। কোন ব্ল্যাকমেলের হুম্‌কি আসেনি। কেউ কোন টাকা কড়ি বা সোনা-দানাও চায়নি। তবে কেন? কেন ওরা এইভাবে লুকিয়ে রাখল ওদের?

রূপেন ও সুখেন বলল—আপনি অত বেশি ভাববেন না। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন আমরা দু'জনে যখন ফিল্ডে নেমেছি তখন আমাদের কিছু করতে দিন। রীতিমতো শেরিফ বদমাস ছাড়া

আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে আসবার মতো দুঃসাহস কারো হবে না। আমরা বুঝতে পারছি, এ আমাদেরই প্রধান শত্রু মিঃ জ্যাঙ্গোর কাজ।

—কী বললে ? কি নাম ? জ্যাঙ্গো !

—হ্যাঁ। জগজিৎ সিং জ্যাঙ্গো। একজন ইণ্টারন্যাশনাল স্মাগলার। এবং এদেশের বহু নারী-শিশুর হত্যাকারী ও একাধিক ব্যাঙ্ক ডাকাতির নায়ক। আমরা জ্যাঙ্গোরই দলের লোক। আজ রাতেই আমরা ওর ঘাঁটি আক্রমণ করব। অবশ্য এর জন্য যা দরকার তা আপনাকে দিতে হবে।

—কী চাও তোমরা ?

—দল থেকে বেরিয়ে আসার সময় যা আমরা খুইয়েছি। অর্থাৎ দু'টো প্রচণ্ড শক্তিশালী রিভলভার।

—বেশ, পাবে। তোমরা বসো ! আমি ব্যবস্থা করছি।

অসমঞ্জবাবু ওদের বসিয়ে বাথরুম সংলগ্ন পাশের ঘরে এলেন। সেখানে দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ ওনার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তারা আদেশের অপেক্ষায় অসমঞ্জবাবুর চোখের দিকে তাকাতেই উনি বললেন—লোক দু'টোকে দেখে তো মনে হচ্ছে, ওরা সতি-সত্যিই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায়। কিন্তু তবুও এটা ওদের একটা ছল হতে পারে। এই টোপ ফেলে ওরা হয়তো আমাকে ওদের ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে চায়। কাজেই আমি ওদের সঙ্গে এগোতে থাকলে তোমরা দূর থেকে নিঃশব্দে আমাকে অনুসরণ করবে। আপাততঃ দু'টো রিভলভার চাই।

ওরা বলল—পাবেন। আমরা জানতাম এগুলো লাগবে। শুধু রিভলভার কেন অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রও আমাদের হাতের কাছেই মজুত রেখেছি। মিঃ কাঞ্জিলালও দশ-বারো জন সাদা পোষাকের পুলিশ নিয়ে বাইরে লুকিয়ে আছেন। আপনারা বাইরে বেরোলেই ওনারা আপনাদের ফলো করবেন।

—থ্যাঙ্কস্। বলে দু'টো রিভলবার নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে

রুপেন সুখেনের হাতে তুলে দিলেন।

রুপেন ও সুখেন সে দু'টি হাতে নিয়ে বলল— ভগবানের কসম। ঐ শয়তান জ্যাঙ্গোকে আমরা এইবার দেখে নেবো। আশা করি আপনার স্ত্রী-পুত্রকে ওদের ড্যারা থেকে উদ্ধার করে আনতে পারব আমরা।

—বেশ, যদি পারো তাহ'লে আমিও কথা দিলাম তোমাদের পূর্বকৃত অপরাধের বোঝা আইনের চোখে যতটা হালকা করানো যায় তার চেষ্টা করব।

রূপেন ও সুখেন রিভলভার দু'টোকে একবার চুমু খেয়ে বলল— ঠিক আছে। তাহ'লে আমরা চলি স্যার।

অসমঞ্জবাবু বললেন—আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

শুধু-শুধু কেন বিপদ বাড়াতে যাচ্ছেন? আগে আমাদের যেতে দিন। আমরা গোপন পথ ধরে অতি সন্তর্পণে যাব। সহসা কোন বিপদে পড়লে পালাবার রাস্তা জানি। কিন্তু আপনি, থাকলে আমাদেরও অসুবিধে হতে পারে।

—আমি যাব।

রূপেন ও সুখেন পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার! তারপর বলল—আপনি কি আমাদের বিশ্বাস করতে পারছেন না?

—পারছি বৈকি। না পারলে কি ও দু'টো তোমাদের হাতে তুলে দিলাম?

—আপনি আসতে চাইলে আমাদের আপত্তির কিছু নেই। তবে এখনো বলছি, যে শত্রুর মোকাবিলা আমরা করতে চলেছি, তাতে আপনার অন্তত না আসাই উচিত।

—বুঝলাম, কিন্তু তোমরা যদি ঐ শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে কোন বিপদে পড়ো তখন তোমাদের রক্ষা করার জন্যও আমার থাকার দরকার নয় কি?

অসমঞ্জবাবু তৈরী হয়েই ছিলেন। তবুও যাবার আগে একবার বাথরুম যাবার অছিলায় পাশের ঘরে গিয়ে সেই দুই পুলিশকে চোখ টিপে ইশারা করলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যেই

না রাস্তায় পা দিতে যাবেন, অমনি এক ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন একদিকে। আর সঙ্গে-সঙ্গে শুনতে পেলেন প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ। চারিদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন? বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই এবং ধোঁয়াটা হাল্কা হতেই দেখতে পেলেন রূপেন পনেরো-ষোলো বছরের একটি ছেলের জামার কলার টিপে ধরেছে। ছেলেটির নিতান্তই দৈন্য দশা।

রূপেন ঠাস করে ওর গালে একটি চড় মারল।

ছেলেটি মার খাওয়া রুগ্ন কুকুরের মতো তাকিয়ে রইল ওর দিকে। মুখে একটু গোঁ-গোঁ শব্দ করল শুধু। বোঝাই গেল ছেলেটি বোবা।

রূপেন বলল—কাকে মারবার জন্যে ওটা ছুঁড়েছিলি? আমাকে না ঐ বাবুকে?

ছেলেটি কথা বলল না। ভয়ে কাঁপতে লাগল।

—বল শিগগির ?

আবার সেই গোঁ-গোঁ শব্দ।

রূপেন অসমঞ্জবাবুকে বলল—আমরা যে এখানে আছি ওরা তাহ'লে টের পেয়েছে। বেশ রীতিমত নজরদারি করছে আমাদের ওপর। এবং সেইজন্যেই নিজেরা না এসে এই নির্বোধ বোবাটাকে পাঠিয়েছে আমাদের ওপর বোম চার্জ করবার জন্য। ভাগ্যি ওটা ফসকে অন্যদিকের দেওয়ালে লেগেছে। নাহলে সর্বনাশ হয়ে যেত।

অসমঞ্জবাবুর কপালের একটা পাশ কেটে গল-গল করে রক্ত ঝরছে। অসমঞ্জবাবু রুমাল দিয়ে সেটাকে চেপে ধরলেন।

সুখেন বলল—আপনার এই অবস্থার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি ওকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আপনাকে ঠেলে না দিলে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারত।

অসমঞ্জবাবু হেসে বললেন—তোমার উপস্থিত বুদ্ধির জন্য ধন্যবাদ।

রূপেন বলল—এখনো ভেবে দেখুন কি করবেন ?

—আমি যাব। কারণ ওরা শুধু তোমাদের শত্রু নয়। আমারও। আমার স্ত্রী পুত্রকে ওরা চুরি করে থাকুক বা না থাকুক, ওরা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা তো করেছিল।

—তাহ'লেই বুঝছেন, ওদের ঘাঁটিতে পৌঁছতে হলে আমাদের একটু অন্যভাবে যেতে হবে।

—হ্যাঁ। তোমরা যে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ এবং আমবা যে ওদের আক্রমণ করব এটা ওরা জেনেই গেছে। তাই আমরা দল বল নিয়ে হৈ-হৈ করে ওখানে যাব না। কারণ যদি ওরা সত্য সত্যই আমার স্ত্রী পুত্রকে লুকিয়ে রেখে থাকে তাহলে ওরা ওদের ক্ষতি করে ফেলবে।

অসমঞ্জবাবু হঠাৎ রূপেনের পেটের কাছে রিভলভার ঠেকিয়ে বললেন—তাহ'লে ইউ আর আণ্ডার অ্যারেষ্ট।

রূপেন এবং সুখেন দু'জনেই ঘাবড়ে গেল।

অসমঞ্জবাবু চাপা গলায় বললেন—সুখেন, এই সুযোগ। তুমি

দৌড়ে পালাও এখান থেকে। যেভাবেই হোক আবার ওদের ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে দোস্তি করার চেষ্টা করো ওদের সঙ্গে। যাতে ওরা ধারণা করে আমরা তোমাদের অবিশ্বাস করে গ্রেপ্তার করেছি এবং তুমি পালিয়ে বেঁচেছ। ওরা অবশ্য এত সহজে তোমাকে বিশ্বাস করতে চাইবে না বা দলে নেবে না। তবুও তুমি ফিরে গিয়ে এমন নাটক করো, যাতে ওরা আপাততঃ আমাদের এখান থেকে নজর উঠিয়ে নেয়।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুখেন ছুটে গিয়ে রাস্তার এক পাশে রাখা নিজের মোটর বাইকটায় চেপে বসল এবং পরক্ষণেই ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল সেখান থেকে।

অসমঞ্জবাবু তখনও সেই একই ভাবে রিভলভারের নলটা রূপেনের পেটের কাছে ধরে রইলেন। তারপর এক চোখ টিপে তাকে আরো একবার বুঝিয়ে দিলেন এ সবই নক্সা। যদি নজর দেবার আরো কোন লোক নিযুক্ত থাকে তো সে দেখুক রূপেন অ্যারেস্ট হয়েছে।

অসমঞ্জবাবু বললেন—এই কে আছো হাতকড়া লাগাও।

সঙ্গে-সঙ্গে দু'জন সাদা পোষাকের পুলিশ এসে শক্ত করে ধরে ফেলল রূপেনকে এবং একজন সেই হাবাটাকে।

একটু পরেই ফোনে খবর পেয়ে পুলিশের গাড়ি এলো।

ওরা সকলেই সেই গাড়িতে চেপে থানায় চললেন।

রূপেনকে এবং সেই হাবা ছেলেটিকে লক্ আপেই রাখা হ'ল।

অসমঞ্জবাবু রূপেনকে বললেন—এই রকম একটু অভিনয় করা ছাড়া আপাততঃ আর কোন উপায় দেখলাম না।

—ভালো করেছেন। কিন্তু বেচারা সুখেন, ও যদি কোন বিপদে পড়ে? একা গেল বেচারী।

—মনে হয় বিপদে পড়বে না। কেননা আমি যা বুঝেছি তা হলো ও অত্যন্ত চতুর এবং সতর্ক। ও জানত আমরা যে কোন সময় আক্রান্ত হতে পারি। এবং জানত বলেই একটা অঘটন ঘটে যাবার আগেই আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। যাক, এবার দেখি এই ছেলেটার

কাছ থেকে কোন কিছু জানতে পারি কিনা।

সুখেন বলল—বৃথা চেষ্টা করবেন না স্যার। আমি ওকে জানি। মেরে ফেললেও ও একটি কথাও বলবে না আপনাকে।

—ওদের কোন গোপন তথ্য আমি তো জানতে চাই না। সেজন্য তো তোমরা আছো। আমি শুধু জানতে চাইব আমার স্ত্রী পুত্র ওদের হেফাজতে আছে কিনা।

—দেখুন চেষ্টা করে।

—প্রয়োজন হলে ইলেক্‌ট্রিকের শক্‌ খাওয়াব ব্যাটাকে।

অসমঞ্জবাবু ধীরে-ধীরে ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর বেশ তৈরী হয়ে একটি আলাদা ঘরে নিয়ে গেলেন তাকে। ছেলে-টিকে বললেন—তুই বোবা?

ছেলেটি হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল শুধু।

—কতদিন আছিস এ লাইনে?

এবারও কিছু বলল না ছেলেটি। মানে বলবার চেষ্টা করল না। অর্থাৎ কথা তো বলতে পারে না একটু ঘাড়ও নাড়ল না।

অসমঞ্জবাবু এবার আদর করার ছলে ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন—তুই যদি আমায় সাহায্য করিস তাহ'লে আমি তোকে কিচ্ছুটি বলব না। আমি পুলিশের লোক। আমাকে সাহায্য করলে তোর ভালো হবে। করবি তো?

ছেলেটি নীরব।

—আমি জানি তুইও অসহায় একটি ছেলে। তোর মা-বাবা কে তাও বোধ হয় তুই জানিস না। ওরা তোকে নিশ্চয়ই খুব ছোটবেলায় কোথাও থেকে চুরি করে এনেছিল। এবং নিশ্চয়ই কোন ওষুধের দ্বারা অথবা ইনজেকশান দিয়ে তোকে বোবা করে রেখেছে। তুই যদি আমার কথার উত্তর দিস তাহলে আমি বড় ডাক্তার দেখিয়ে তোকে ভালো করে তুলব। আমার কথার উত্তর দিবি তো?

ছেলেটি এবার হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল।

—আমার ছেলে, আমার বউ কোথায় আছে তুই জানিস্ ?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

—তুই তাদের দেখেছিস ?

ছেলেটি আবার ঘাড় নাড়ল।

—অসমঞ্জবাবু বললেন, আমি যদি চাই তুই আমাকে সাবধানে নিয়ে যেতে পারবি সেখানে ?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

—আমি এখনই যাব।

অসমঞ্জবাবু আসবার আগে আর একবার রূপেনের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন—আমি ছেলেটির সঙ্গে যাচ্ছি। তুমিও মেক-আপ নিয়ে ছদ্মবেশে সুখেনের খোঁজে যাও। চুপ চাপ বসে থাকার একদম সময় নেই।

রূপেন বলল—সে আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। তবে আপনি কিন্তু ঐ বদমাসটার সঙ্গে খুব সাবধানে যাবেন। ওর কোন কথা বিশ্বাস করবেন না। ও ভীষণ মিথ্যে কথা বলে।

—বলো কি ?

—হ্যাঁ। হয়তো আগাগোড়া ঘাড় নেড়ে সবই আপনাকে মিথ্যে বলেছে।

অসমঞ্জবাবু ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধকারে ওরই নির্দেশিত পথে বালিয়াড়ীতে এসে নামলেন। তারপর সমুদ্র সৈকত ধরে এগিয়ে চললেন চন্দনেশ্বরের দিকে। বেশ খানিকটা যাবার পর এক সময় অনুভব করলেন কে বা কারা যেন অনুসরণ করছে তাঁকে ! হয়তো দীঘা পুলিশ নিরাপত্তার জন্য পিছু নিয়েছে তাঁর। কিন্তু না। সে ভুল ভাঙল যখন জোড়া-জোড়া টর্চের আলো তাঁর সর্বাঙ্গে এসে পড়ল। অসমঞ্জবাবু থমকে দাঁড়ালেন ! আর সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল গুড়ুম'।

বোবা ছেলেটি রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়লো বালুচরে।

অমনি অন্ধকার বিদীর্ণ করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি গিয়ে বিদ্ধ করল

আততায়ীদের। সম্ভবতঃ এগুলো পুলিশের গুলি। অসমঞ্জবাবু নিজেও গুলি চালাতে গেলেন। কিন্তু পারলেন না। ততক্ষণে আততায়ীদের একটি বুলেট এসে বিদ্ধ করেছে তাঁকে। তাঁর হাতের রিভলভার ছিটকে পড়ল সমুদ্রের জলে। তিনিও বালুচরে লুটিয়ে পড়লেন। সাদা পোষাকের পুলিশরা হৈ হৈ করে ছুটে এলো তাঁর দিকে।

৮
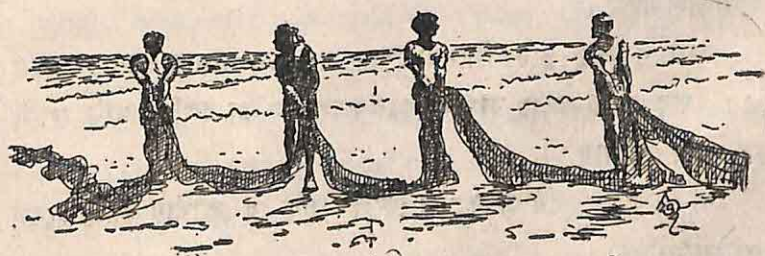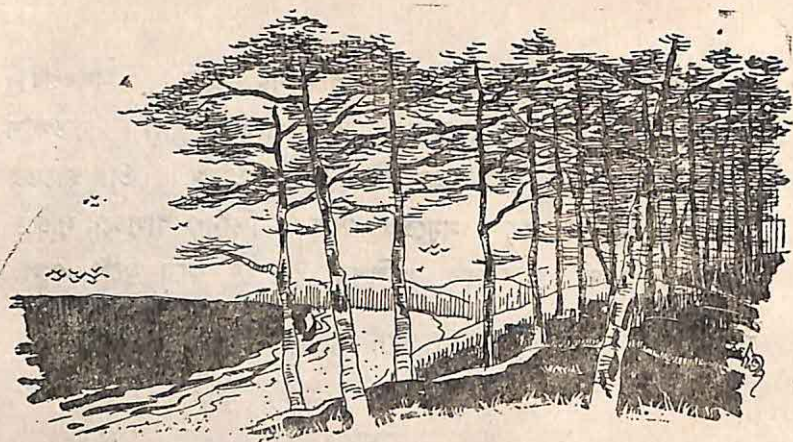
বাপ্পার যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখল একটি অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরে শুয়ে আছে সে। ঘরের ওপর দিক থেকে ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু রোদের ছটা দেখা যাচ্ছে। এই দেখে মনে হয় ও কোন আণ্ডার গ্রাউণ্ডে আছে। ওর মাথার কাছে বসে-বসে বিড়ি টানছে ওরই মতো দু'টো ছেলে। বাপ্পা ক্ষীণস্বরে বলল—আমি কোথায়?

ছেলে দু'টি খিল-খিল করে হেসে উঠল একবার। তারপর ওর দিকে মিটিমিটি চোখে তাকিয়ে একজন অপরজনকে বলল—চালু পুরিয়া রে? এতক্ষণ কেমন চুপচাপ শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। এখন নেকার মতো জিজ্ঞেস করছে, আমি কোথায়? কি বলি বলতো?

অপরজন বলল—বল, মেট্রো সিনেমার লবিতে।

বাপ্পা উঠে বসে দু'হাতে চোখ রগ্ড়ে বলল তোমরা কারা?

—আরে! তাও জানো না? আমার নাম ধর্মেন্দর ওর নাম অমিতাভ বচ্চন।

বাপ্পা বুঝল দু' দুটো সিনেমা খোর বখাটের-পাল্লায় এসে পড়েছে ও। তবু ওদের কথায় রাগ না করে বলল—সত্যি বলছি, আমি জানি না আমি কোথায়।

—সেকি! তুমি আঁতুড়ের ছেলে নাকি যে কোথায় ভূমিষ্ঠ হয়েছ তা জানো না!

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাপ্পার সবুট লাথি ছেলেটির মুখে এসে পড়ল।
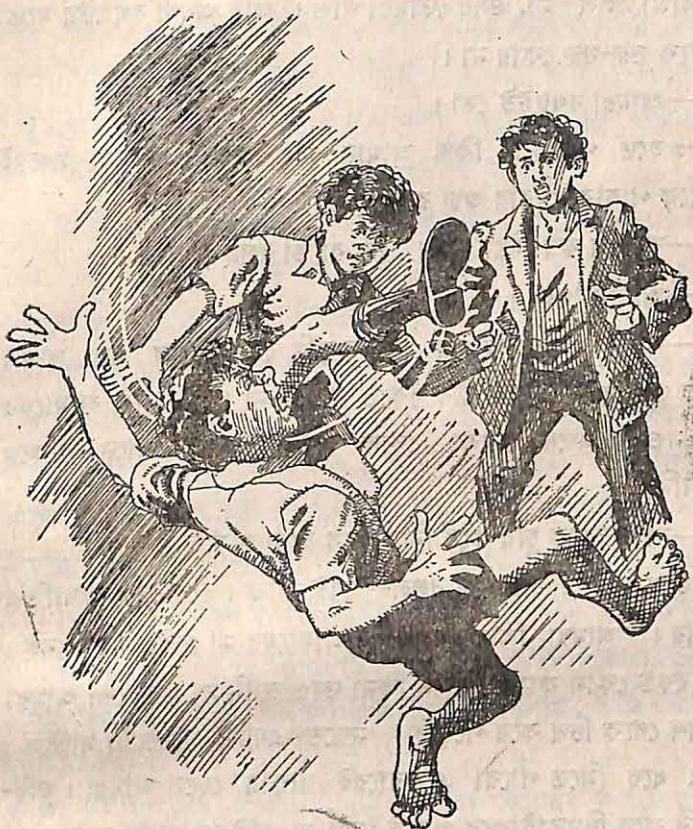
অপর ছেলেটি তারই মোকাবিলা করবার জন্য যেই না বাপ্পাকে আক্রমণ করতে যাবে অমনি আর এক লাথি এসে পড়ল তার মুখে।

ছেলে দু'টি ছিট্‌কে পড়ল দুদিকে। তারপর মুখে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল—কামাল কর দিয়া গুরু। আমরা যদি ধর্মেন্দর-অমিতাভ হই, তুমি তো তাহ'লে ড্যানি।

বাপ্পা বলল—শোনো, তোমরা কে তা জানি না। যদি আমাকে এখান থেকে পালাবার সুযোগ করে দিতে না পারো তাহ'লে তোমরা খুব ভুল কাজ করবে।

—কি আবোল-তাবোল বকছ তুমি গুরু? আমরা তোমাকে ধরে

এনেছি না বেঁধে রেখেছি ? একটা বিড়ি খাবে ?

বাপ্পা বলল—না, ওসব তোমরা খাও। আর অযথা বখাটের মতো আমাকে গুরু-গুরু কোর না।

—আমরা বখাটেই তো।

—হতে পারো। কিন্তু আমার নাম বাপ্পা। তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে পাহারা দেবার জন্য রয়েছ ?

—কামাল কর দিয়া গুরু। কি যা তা বলছ ?

—আবার 'গুরু' !

—ওঃ হোঃ তোমার গুরু বললে তুমি তো আবার খচে যাও। তা কি তুমি বলছ আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কি আমাদের মতো নও ? মানে নিজের থেকে পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে থাকোনি ?

—না আমাকে চুরি করে নিয়ে এসে রাখা হয়েছে।

ছেলে দু'টি বিস্মিত হয়ে বলল—তাই নাকি। তবে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। আমরা কিন্তু তা নই। আমাদের মা নেই, বাবা নেই। তারা কেউ কোন কালে ছিলেন কিনা তাও জানি না। হয়তো আমরা আকাশ থেকে টিপ করে পড়েছি। নয়তো এমনিই গজিয়েছি মাটিতে। অর্থাৎ ধরে নিতে পারো একেবারেই রাস্তার ছেলে আমরা। চুরি-চামারি করে ছিনতাই করে পকেট মেরে যা পাই তা সমান ভাগে-ভাগ করে নিই দু'জনে। আমাদের মধ্যে হিসাব নিয়ে কোন গোলমাল হয় না কখনো। আমাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, ফুটপাথই আমাদের ঠিকানা। আমরা বেশির ভাগ সময় বজবজে থাকি। একবার মেট্রোয় সিনেমা দেখতে গিয়ে ভুল করে পকেট মেরে বসে আছি এক দারোগার। তারপর যখনই বুঝতে পেরেছি হাতটা একটু অন্য জায়গায় পড়ে গেছে আর পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের অমনি 'মার খিঁচ'। ওয়েষ্ট বেঙ্গল থেকে পালিয়ে এসে একেবারে উড়িষ্যায়। কিছুদিন বালেশ্বরে থেকে এখন এই পোড়ো বাড়িটাতে আশ্রয় নিয়েছি। এটা মাটির নিচের ঘর। এর একপাশের মাটি সরে যাওয়ায় সেখানকার ইটের ফাঁক দিয়ে

একটা গর্ত করে নিয়েছি আমরা। তাই দিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকি। আমরা প্রায়ই রাত্রিবেলা এখানে আশ্রয় নিই এবং দিনের বেলা কাজ কর্ম করতে যাই। তা থেকে ভেবেছিলাম তুমিও বুঝি আমাদের মতোই 'এগারো নম্বরি'। কিন্তু তুমি এসব কি বলছ?

—যা বলছি ঠিকই বলছি। বিশ্বাস করো ভাই। আমার বড় বিপদ। তোমরা কি পারবে আমাকে উদ্ধার করতে?

ছেলে দু'টি এবার অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল বাপ্পার মুখের দিকে। তারপর বলল—তুমি আমাদের ভাই বলে ডাকলে? আমাদের এক বন্ধু ছিল তার নাম স্যাণ্ডুইচ্। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলে। একমাত্র সে-ই আমাদের ভাই বলে ডাকত। সেই আমাদের 'গুরু' বলতে শিখিয়েছে। চুরি-ছিনতাই শিখিয়েছে। দু'একটা ইংরেজী নাম শিখিয়েছে। তা সে এখন নেই। খারাপ অসুখ করে মরে গেছে ছেলেটা। কিন্তু আমরা দু'জনে প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববখাটে এবং রাস্তার ছেলে জেনেও তুমি যখন আমাদের ভাই বলে ডেকেছ তখন তোমার এই ভাই ডাকের মর্যাদা আমরা দেবোই। তোমার জন্যে জান দিয়ে দেবো আমরা।

বাপ্পা বলল—ঠিক আছে। যদি তোমরা কোনরকমে আমাকে মুক্তি দিতে পারো এদের খপ্পর থেকে, তাহ'লে আমিও তোমাদের জন্যে যথাসাধ্য করব। যাতে তোমরা ভালো ছেলে হতে পারো, ভালো খেতে মাখতে পাও, ভালো একটা আশ্রয় পাও সব ব্যবস্থা করে দেবো। তোমরা ইস্কুলে পড়বে, লেখাপড়া শিখবে। মানুষের মতো মানুষ হবে। তোমাদের দু'জনের আমি নতুন নাম দেবো। অনেক কিছু করব।

—সত্যি বলছ, তুমি আমাদের জন্যে এত সব করবে?

—সত্যি বলছি। কেননা তোমরা যে আমার ভাই। তাছাড়া তোমরা তো জানো না আমি একজন পুলিশ অফিসারের ছেলে। আমার বাবার ক্ষমতা অনেক।

পুলিশের নাম শুনেই লাফিয়ে উঠল ছেলে দু'টি। বলল—ও।

তাই বলো। সেইজন্যেই ওরা তোমাকে এইখানে এনে লুকিয়ে রেখেছে। শোনো ভাই, পুলিশের সঙ্গে কিন্তু আমাদের অত্যন্ত দুশমনি। পুলিশ আমাদের ধরতে পারলে পিটিয়ে ছাল তুলে দেবে।

—না। তোমরা আমার উপকার করলে পুলিশ তোমাদের কিচ্ছু বলবে না। আমি বাপিকে বলে দেবো তোমাদের কিছু না বলতে। আর তাছাড়া তোমরা তো এরপর খারাপ ছেলে থাকছ না। কিন্তু তোমাদের কি সত্যিই ফিল্মস্টারের নাম ছাড়া আর কোন নাম নেই?

—আছে। ও নামও অবশ্য আমাদের নিজেদের দেওয়া না। অর্থাৎ আমাদের সেই বন্ধু স্যাণ্ডুইচ, সে-ই নাম রেখেছে আমাদের। আমার নাম অ্যাটম ওর নাম পেটো।

এমন সময় ঘরের এক কোণে ছাদের দিকে একটু ঘরঘর শব্দ শোনা গেল। দেখা গেল ঘরে নামা-ওঠার জন্যে একটা চৌকো মুখ আছে তার মুখটা ঢাকা দেওয়া ছিল, সেটা সরে গেল। অমনি দেখা গেল একটা দড়ির মই নেমে আসছে।

অ্যাটম আর পেটো লাফিয়ে উঠে বলল—মনে হচ্ছে যারা তোমাকে এখানে রেখেছিল তারা আসছে। যদি ওরা তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যায় তাহ'লে আমরা ও'দের ফলো করব। আর নাহলে পরে এসে উদ্ধার করব তোমাকে। এখন আমরা পালাই। বলেই গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে বাইরের একটি মানুষ প্রমাণ বড় ড্রেনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল ওরা। ড্রেনটি শুকনো। শহরের ময়লা জল নিষ্কাসন হয় এর ভেতর দিয়ে। ড্রেনের মুখের কাছেই সমুদ্রের জল চলে এসেছে এখন। কেননা এটা জোয়ারের সময়। ওরা সেই জলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে লাগল।

বাপ্পা এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওপর দিকে। দড়ির মই বেয়ে বলিষ্ঠ চেহারার এক ন্যাড়া মাথা বেঁটে মস্তানকে নেমে আসতে দেখা গেল। তার হাতে কলা, পাঁউরুটি, ডিম সেদ্ধ ইত্যাদি। লোকটা নেমে এসে দাঁত বার করে বাপ্পার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

বাপ্পার গা যেন জ্বলে গেল। ভালো করে তাকিয়ে সেই দেঁতো

হাসির ছিরি দেখেও সে বুঝতে পারল না ওগুলো দাঁত না অন্য কিছু।

লোকটি তেমনিই হাসতে-হাসতে বলল—দেখছ কি? কি এত দেখার আছে?

—তোমার দাঁতের ছিরি দেখছি।

—ও আর অত করে দেখার কি আছে? এখন খেয়ে নাও। আমার এই দাঁতগুলো একটা সোনা, একটা রূপো, একটা লোহা, একটা পেতল আর তামা দিয়ে বাঁধানো।

বাপ্পা হঠাৎ ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে উঠে ওর মাথা দিয়ে লোকটার পেটে একটা গোত্তা মেরে বলল—এটা তো বেশ নরম দেখছি। এর ভেতরের নাড়ি-ভুঁড়িগুলো নিশ্চয়ই তার দিয়ে পাকানো নয়।

লোকটার হাত থেকে খাবারগুলো পড়ে গেল। সে দু'হাতে পেট চেপে বসে পড়ে যন্ত্রণায় কাৎরাতে লাগল। বাপ্পা একটা ডিম সেদ্ধ কুড়িয়ে নিয়ে লোকটার মুখে গুঁজে দিয়ে বলল—এটা খেয়ে নাও। খুব পুষ্টির খাদ্য এটা। খেলে শরীরে বল পাবে। উঠে দাঁড়াতে পারবে। বলেই ঝুলন্ত দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠে পড়ল। তারপর মইটা তুলে নিয়ে মুখটা আবার ঢাকা দিয়ে চারিদিক বেশ ভালো করে দেখে নিল।

আসলে এটা একটা পোড়ো বাড়ি। এর নিচে আণ্ডার গ্রাউণ্ড ঘর। হয়তো কোন জমিদার কোন সময়ে তৈরী করিয়ে ছিলেন এটা। এখন শয়তানরা তাদের খারাপ কাজের জন্য ব্যবহার করছে। একেবারে ঘন ঝাউবন, বালিয়াড়ী আর সমুদ্রতীরে এই ভাঙা পোড়ো বাড়ি। সমুদ্র হয়তো অচিরেই গ্রাস করবে এটিকে। যাই হোক এর ভেতর থেকে একবার বেরতে পারলে আর ওকে পায় কে? বাপ্পা ধীরে-ধীরে বাড়ি থেকে বেরিয়েই উঁচু একটি বালিয়াড়ীতে এসে পৌঁছুল।

সঙ্গে-সঙ্গে দু'জন ষণ্ডা মার্কা জোয়ান লোক ছুটে এলো ওর দিকে—আরে! এ ছেলেটা এখানে বেরিয়ে এলো কি করে?

বাপ্পা চকিতে দু'মুঠো বালি তুলে ছুঁড়ে দিল দু'জনের চোখে। একজন তো 'গেলুম রে বাবা রে' বলে বসে পড়লেও অপরজন শক্ত

হাতে ধরে ফেলল বাপ্পাকে। তারপর বেশ কঠিন হাতে ওকে ধরে টানতে-টানতে আবার সেই ঘরের ভেতর নিয়ে এলো। তারপর সিঁড়ির মুখের ডালা সরিয়ে দড়ির মইটা নামিয়ে দিতেই নিচের লোকটি উঠে এলো ওপরে। উঠে এসেই বাপ্পার গালে মারল এক চড়। তারপর ওর হাত ছ'টো শক্ত করে বেঁধে আবার ওকে নামিয়ে আনল নিচের ঘরে।

যে লোকটার পেটে আঘাত করে বাপ্পা পালিয়েছিল সে লোকটি বাপ্পার চুলের মুঠি ধরে বলল—বড্ড বেশি মস্তান হয়েছিস না? পুলিশের বাচ্চা এর মধ্যেই মারপিটের অনেক রকম কায়দা রপ্ত করেছিস দেখছি। এবার কি করবি? বেশ ছাড়া ছিলি, এবার বাঁধা থাক। এরপরও যদি বেশি বেয়াদপি করিস তো গলা টিপে মেরে ফেলব। তারপর বস্তায় পুরে ফেলে দেবো সমুদ্রের জলে। কেউ টেরও পাবে না।

বাপ্পা ক্ষোভে-ছঃখে কেঁদে ফেলল এবার।

ওর কান্না দেখেও মন ভিজল না ওদের। বলল—কোনরকমে এখান থেকে পালাবার চেষ্টা কোর না বুঝলে? আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই তোমার সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাপ্পা বলল—আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমার মায়ের কাছে যাব। আমার বাপির কাছে যাব আমি, আমাকে ছেড়ে দাও।

লোকটি বলল—কেন, তোমার বাবা তো মস্ত গোয়েন্দা। পরের ছেলে হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করেন। এখন নিজের ছেলেকে খুঁজে বার করুন। এ এমন জায়গায় নিয়ে এসে ফেলেছি যে তোমার ঠাকুর্দা এসেও উদ্ধার করতে পারবেন না তোমাকে।

বাপ্পা বলল—আমি কোথায়?

—আমাদের খপ্পরে, আবার কোথায়? তা যাক। শোনো, তুমি এখন আমাদের ছেলে। যা বলি মন দিয়ে শোনো। এইখানে ঘরের মেঝেয় যে খাবারগুলো পড়ে আছে, ওগুলোই আপাততঃ কুড়িয়ে খেয়ে নাও। আমরা হয়তো সারাদিনে আর নাও আসতে পারি।

যদিও হাত বাঁধা আছে, তবুও খেতে অসুবিধে হবে না। কেননা সামনের দিক থেকে বাঁধা। ঘরের কোণে একটা কুঁজোয় জল আছে। কষ্ট করে গড়িয়ে খেও। কোন গ্লাস নেই কিন্তু। পারি তো আমরা রাত্রিবেলা আসব। বলেই চলে গেল ওরা।

ওরা চলে গেলে অসহায় বাপ্পা অনেকক্ষণ গুমরে-গুমরে কাঁদল। তারপর মেঝে থেকে সেই ছড়িয়ে থাকা খাবারগুলো কুড়িয়ে-কুড়িয়ে খেল। এছাড়া উপায়ই বা কি। অ্যাটম আর পেটো কি ওকে উদ্ধার করতে সত্যিই আসবে? যদি আসে তো কখন আসবে ওরা? কিন্তু যদি না আসে? তাহ'লে বাপ্পার জীবনের অন্তিম পরিণতি কি হতে পারে, তা ওর অজানা নয়। খবরের কাগজে এইরকম ছেলে চুরির ঘটনা ও অনেক পড়েছে। কাজেই সেইরকম একটা মর্মান্তিক পরিণতির কথা মনে হতেই সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল ওর।

* * *

না। সারাদিনে আর কেউ এলো না। খিদের জ্বালায় ছটফট করে ঐ বদ্ধ ঘরে বাপ্পার সারাটা দিন যে কিভাবে কাটল, তা বলার নয়। সন্ধ্যের পর টর্চ হাতে গোপন পথে চুপিসারে অ্যাটম আর পেটো এসে হাজির হ'লো।

ওরা এসে বলল—কি গো, এখনো রেখেছে ওরা তোমাকে? আমরা তো ভাবলাম নিয়েই গেছে বোধ হয়। সকালে অনেকক্ষণ বাড়িটার দিকে নজর রেখেছিলাম আমরা। কিন্তু তোমাকে কেউ নিয়ে যাচ্ছে এমন দৃশ্য দেখিনি। দুপুরবেলা আমরা খেতে গিয়েছিলাম। ফিরতে অনেক দেরী হয়ে গেল। তোমার জন্যে খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমাদের। ভাবলাম তোমাকে কথা দিয়েও আমরা হয়তো আমাদের কথা রক্ষা করতে পারলাম না। এতক্ষণে ওরা নিশ্চয়ই তোমাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে এখান থেকে। তবে এখনো যখন তুমি আছো, তখন আর তোমার ভয় নেই।

বাপ্পা বলল—ভগবান তোমাদের ভালো করুন ভাই। তবে আগে তোমরা আমার বাঁধন খুলে দাও।

ওরা ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে বাপ্পাকে বাঁধন মুক্ত করল।

বাপ্পা বলল—ওঃ বাঁচালে। কিন্তু আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। তোমরা এখুনি আমাকে নিয়ে পালিয়ে চলো এখান থেকে। সকালে আমি পালাতে গিয়েও ধরা পড়ে গেলাম।

—ঠিক আছে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। বলে ব্যাগের ভেতর থেকে কিছু খাবার বার করে বলল—আগে এগুলো খেয়ে নাও দেখি।

—কি আছে ওতে ?

—আরে খাও না। কয়েকটা কচুরি, ছানার গজা, অমৃতি এইসব আছে। না খেলে পালাবে কি করে ?

—দেরী হয়ে যায় যদি ?

—যায় যাবে। তবে জেনে রেখো এখন যখন আমরা দু'জনে এখানে এসে গেছি, তখন কারো আর সাধ্য নেই যে আমাদের কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নেয়। মনে রেখো তুমি এখন ওদের খপ্পরে নয়। ওরা এখন আমাদের খপ্পরে।

—কি যে বলো। ওরা অত্যন্ত সাংঘাতিক।

—আমরা ওদের চেয়েও সাংঘাতিক। বিশেষ করে রাত্রিবেলা আমাদের দু'জনকে যেন ভূতে এসে ভর করে। আমরা পারি না এমন কোন কাজ থাকে না। যাক গে। এখন ধীরে সুস্থে খেয়ে তো নাও।

বাপ্পা গোগ্রাসে খেতে লাগল।

অ্যাটম বলল—আমরা একবার দীঘায় গিয়েছিলাম। সেখানে একটা দুঃসংবাদ পেলাম।

—কি দুঃসংবাদ ?

—তোমার মাকেও ওরা নিয়ে গেছে।

—সেকি ! আমার মা-মণিকে···

—হ্যাঁ। আমার যতদূর ধারণা ওরা তোমাদের পরিবারের সবাইকে এক-এক করে শেষ করে দেবে। দীঘায় গিয়ে একবার তোমার মায়ের ঘটনাটা শুনে মনে হ'লো পুলিশ তোমাকে উদ্ধার

করলে ওরা যদি তোমার মাকে মেরে ফেলে ? তাছাড়া ধরো পুলিশ আসার আগেই তুমি যদি এখান থেকে পাচার হয়ে যাও, তাহলে আমরা দুজনে ফল্‌স্ পজিশনে পড়ে যাব। এবং মিথ্যে কথা বলার দায়ে মার-ধোর খেয়ে মরব। বিশেষ করে পুলিশের খাতায় আমাদের রেকর্ড ভালো নয়।

বাপ্পা ডুকরে কেঁদে উঠল একবার। তারপর বলল—ওঃ হো। তোমরা কি ভুল করলে ভাই। কেন একবার পুলিশকে বললে না। আমার মা, মা-মণি—আর কি মাকে আমি কখনো দেখতে পাবো। ওরা কোথায় নিয়ে গেল আমার মাকে ?

—আরে যেখানে নিয়ে যাক। আমরা ফিরিয়ে তাঁকে আনবই। অত ভেঙে পড়লে চলবে কেন ? থাকলে কাছে পিঠেই থাকবেন উনি। চারিদিকে যে রকম পুলিশের টহলদারি তাতে পালাতে বেশী-দূর হবে না।

বাপ্পার খাওয়া শেষ হতেই ওরা বলল—এবার পালানো যাক। আগে আমরা তোমাকে আমাদের গোপন ড্যারায় লুকিয়ে রাখি, তারপর আসল ঘাঁটির খোঁজ নিচ্ছি ওদের। জেনে রেখো, এটা ওদের আসল ঘাঁটি নয়। ওরা ভীষণ চালাক। তাই তোমাকে অপহরণ করে নিজেদের ড্যারায় না রেখে এইখানে লুকিয়ে রেখেছে। া যাক। তুমি এখন মুক্তি পেলেও তোমার বাবার কাছে যাবে না বা পুলিশকে ধরা দেবে না। ওরা তাহলে অঞ্চল ছেড়ে পালাবে। হয়তো তোমার মায়েরও ক্ষতি হবে তাতে। তোমার অন্তর্ধান রহস্য যেমন পুলিশের কাছে তেমনি ওদের কাছেও রহস্যময় হয়ে উঠুক। পরে অবস্থা বুঝে আমরা ব্যবস্থা করব।

বাপ্পা খুব তাড়াতাড়ি ওদের সব কিছু বুঝে নিয়ে কুঁজো থেকে জল ড়িয়ে ঢক-ঢক করে খেয়ে বলল—চলো, আর দেরি নয়।

ওরা তিনজনে সেই গুপ্ত স্থানে এলো। তারপর গর্ত দিয়ে হটাকে গলিয়ে দিয়ে ঝুপ-ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল সেই অন্ধকার নের ভেতর। অ্যাটম টর্চ জ্বেলে অন্ধকার পার হয়ে সমুদ্রতটে

পৌঁছল। তারপর বাইরেটা খুব ভালো করে একবার দেখে নিয়ে ইশারা করল ওদের। পেটো বাপ্পাকে নিয়ে বাইরে এলো।

সমুদ্রে তখন ভাঁটার টান। সমুদ্র তাই অনেক দূরে সরে গেছে। ওরা সেই কনকনে ঠাণ্ডায় বেলাভূমি ধরে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল।

অনেকদূর যাবার পর এক গভীর বনের মধ্যে ঢুকল ওরা। এই-খানে একটি সুবৃহৎ গাছের গুঁড়ির কাছে এসে অ্যাটম বলল—আমরা এখন কোথায় আছি জানো তো? উড়িষ্যায়। তুমি যেখানে ছিলে সেটাও উড়িষ্যা। তবে বর্ডারে। ঐ দেখা যায় দূরে চন্দনেশ্বরের মন্দির। খুব জাগ্রত দেবতা। এক মন হয়ে বাবাকে ডাকলে বাবা ডাক শোনেন। আমরা কাজুবাদামের বনে এসে ঢুকেছি। এই বনে একটা বাদাম গাছের মগডালে আমাদের ঘাঁটি। তোমাকে এখানে লুকিয়ে রেখে আমরা ওদের আসল ঘাঁটির খোঁজ নিতে যাব। এবং চেষ্টা করব তোমার মায়েরও খোঁজ খবর নেবার।

—কিন্তু ভাই, আমি তো গাছে উঠতে পারি না।

—সে জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না গাছে ওঠার উপায় আমাদের করাই আছে। বলেই এক পাশের একটি ডাল থেকে একটি শক্ত মোটা লতাকে টেনে আনল। বলল—এইটা ধরে উঠতে হবে। পারবে তো?

—হ্যাঁ পারব।

সেই লতা ধরে ওরা তিনজনেই উঠে পড়ল ওপরে। গাছের অনেকটা ওপরে প্রায় মগডালের কাছাকাছি বেশ কয়েকটি ডালের সঙ্গে বাঁশ-বাঁখারি দিয়ে চমৎকার একটি মজবুত মাচা করা আছে দেখতে পেল বাপ্পা। অন্তত দু'-তিনজন সেখানে অনায়াসে শুয়ে-বসে থাকতে পারে। ঘন পাতার আড়ালে সে এক এমনই নিরাপদ আশ্রয় যে সেখানে লুকিয়ে থাকলে দিনমানেও কেউ কিছু টের পাবে না।

অ্যাটম বলল—তুমি এইখানে সারারাত শুয়ে থাকো। হয়তো

একটু ঠাণ্ডা লাগবে। তা কি আর করা যাবে। চটফট ঘুঁই বলল, আছে, এখানে সব গায়ে চাপা দিয়ে নাও। আর এই নাও দড়ি। নিজেকে বেশ শক্ত করে বেঁধে রাখো এর সঙ্গে। যাতে ঘুমিয়ে পড়লে পাশ ফিরতে গিয়ে পড়ে না যাও।

বাপ্পা বলল—কিন্তু আমার এখানে লুকিয়ে থেকে লাভ ?

—লাভ আছে বৈকি ভাই। তুমিই তো এখন সোনার হরিণ। তোমার এখন কোন মতেই আত্মপ্রকাশ করা চলবে না। আমরা হু'জনে যখন ফিল্ডে নেমেছি, তখন তুমি একদম নিশ্চিন্ত থাকো। আমরা কাগজ-পেনসিল নিয়ে আসব। প্রয়োজন বুঝলে কাল তুমি একটা চিঠি লিখে দেবে। সেটা তোমার বাবাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। তারপর তিনি নিজে এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন তোমাকে। নাহলে আমাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে যদি আবার ধরা পড়ে যাও তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—তোমরা এখন কোথায় যাচ্ছ তাহ'লে ?

—সেই ভাঙা বাড়ির কাছে। যেখানে তুমি ছিলে। সেখানে সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই তার পিছু নেবো আমরা। তারপর ঘাঁটিটা চিনে আসতে পারলে হৈ-চৈ পাকিয়ে কেলেঙ্কারির চরম করে তুলব আমরা। তবে খুব সাবধান। আমরা না আসা পর্যন্ত তুমি যেন গাছ থেকে নেমো না।

বাপ্পা বলল—ঠিক আছে ভাই। যা তোমরা ভালো বোঝো তাই করো

অ্যাটম আর পেটো চলে গেল।

ওরা চলে যেতেই সেই ঘন অন্ধকার বাদাম বনের একটি গাছের আড়াল থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে মৃদু একটু হেসে দেশলাই জ্বেলে একটা বিড়ি ধরাল।

—তা-তো বলতে পারব না। দিনের বেলাও হতে পারে, সন্ধ্যের সময়ও হতে পারে।

—আমরা কিন্তু সন্ধ্যেবেলা একটি ছেলেকে বালির ওপর দিয়ে ছুটতে দেখেছিলাম। ছেলেটা আমাদের দেখে আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল। আমরা ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছেও দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যেই না বলেছে ও একজন পুলিশ অফিসারের ছেলে, অমনি বলব কি গুরু মাথাটা উঠল চড়াৎ করে। দিলাম এই যন্তরটা ব্যাটার পেটের ভেতর ফকাৎ করে ঢুকিয়ে। ছেলেটা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। তারপর যখন দেখলাম ছেলেটা মরেই যাবে তখন খুব ভয় হোল ? হাজার হলেও পুলিশের ছেলে তো। দুজনে মিলে টেনে হিঁচড়ে ছেলেটাকে দিলাম ছুঁড়ে সমুদ্রের জলে। অমনি গুড্ লাক কিরকম দেখো, কোথা থেকে একটা হাঙড় এসে ঝাপিয়ে পড়ল ছেলেটার ওপর। তারপর আলুভাতের মতো ওকে মুখে নিয়ে উধাও হ'লো গভীর সমুদ্রে।

—বলিস কিরে ! একেবারে মেরেই ফেললি ?

—হ্যাঁ, ঐ কাজটা আমরা খুব চটপট করে ফেলতে পারি।

—যাক। যা হবার হয়েছে এখন চল দেখি আমাদের বসের কাছে নিয়ে যাই তোদের। বস খুব রেগে যাবে আমাদের ওপর। তবু ভালো যে বুদ্ধি করে ছেলেটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিস এবং হাঙরটা সময় মতো এসে খুনের প্রমাণ লোপ করে দিয়েছে। সবই দৈবের যোগাযোগ।

—হ্যাঁ। দৈব যে কবে এইরকম যোগাযোগ ঘটিয়ে তোমাদেরও ঐ ছেলেটার মতো দশা করবে তাই ভাবছি। চলো, ঘুম তো মাথায় উঠল। এখন তোমাদের বস কিরকম একবার দেখে আসি।

ওরা সেই অন্ধকারে লোক দু'টির পিছু নিল।

ওদের সঙ্গে বালিয়াড়ীর ওপর দিয়ে যেতে যেতে অ্যাটম আর পেটো খুব সতর্কভাবে চারিদিকে নজর রেখে পথ ঘাট চিনে নিতে লাগল। দরকার হলে এই পথেই আবার হয়তো আসতে হবে ওদের।

লোক দুজন বলল—দেখ ভাই, তোরা খুব খতরনক ছেলে আমরা জানি। কিন্তু আমাদের দলের সঙ্গে যদি বেইমানি করিস তাহলে কিন্তু সর্দার তোদের আস্ত রাখবে না। আর এমনিতেই তোরা হচ্ছিস দাগী ছেলে। পুলিশের খাতায় রেকর্ড তোদের অত্যন্ত খারাপ। কাজেই পুলিশের চোখ রাঙানির হাত থেকে যদি বাঁচতে চাস তো আমাদের দলে আয়। কিন্তু আমরা ভেবে পাচ্ছি না এইটুকু বয়সে তোরা এত শয়তান কি করে হলি ?

অ্যাটম বলল—আরে গুরু, আমরাও তো ভেবে পাচ্ছি না তোমাদের এতখানি বয়েস হয়েছে, বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে তবুও তোমরা একরকম শয়তানের ধাড়ি হয়ে এই সব বদ কর্ম করে বেড়াচ্ছো কেন ? আমরা না হয় অকালে পেকেছি। তোমরা ? তোমরা কোন সকালে পেকেছো বাবা ?

—নাঃ। তোরা বড্ড ডেঁপো হয়েছিস দেখছি। তোদের সঙ্গে কথায় আমরা পেরে উঠব না। তবে ঐ ছেলেটাকে মেরে দিয়ে তোরা কিন্তু ঠিক কাজ করিসনি।

পেটো বলল—ঠিক বলেছো গুরু। আমাদেরও মনে হচ্ছে কাজটা ভালো হয়নি। এখন তোমাদের দু'টোকে মেরে পঁচিশ পূর্ণ করতে পারলেই মনে হয় কাজটা ভালো হবে।

লোক দুটি শিউরে উঠল—বলিস কিরে!

—হ্যাঁ। কেননা, না তোমরা ছেলেটাকে চুরি করে আটকে রাখলে ও আমাদের পাল্লায় পড়লো। আমাদের পাল্লায় পড়ল বলেই তো মরল। ওর মৃত্যুর জন্যে আমরা নয়, তোমরাই দায়ী।

ওরা বলল—আসলে ঐ ছেলেটা যে পুলিশের ছেলে তা আমরাও জানতাম না। আমাদের দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে রূপেন ও সুখেন নামে দু'জন লোক পালিয়েছিল। আমরা অনেক চেষ্টা করেও লোক দু'টোকে ধরতে পারছিলাম না। ওরা যেন ফাঁকা মাঠের বেড়াল। যাই হোক ওদের দু'জনকে নজরে রাখতে গিয়েই ছেলেটা হঠাৎ আমাদের চোখে পড়ে যায়। আমরাই চালাকি করে কৌশলে

ছেলেটাকে অপহরণ করে এনে ঐ ভাঙা বাড়িতে আটকে রাখি। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম রূপেন ও সুখেন ঐ ছেলেটাকে গুম্ করতে অথবা মারতে চেয়েছিল। তাই ভেবেছিলাম ছেলেটিকে আমরা ওর অপহরণকারী নয়, উদ্ধারকারী হিসেবে পরিচয় দেবো। এবং ছেলেটির মা-বাবা যখন খবরের কাগজে মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দেবেন তখনই নিয়ে যাবো ওকে। তারপর রূপেন ও সুখেনের বর্ণনা দিয়ে ওদের অ্যারেষ্ট করিয়ে দেবো। এতে আমরা প্রতিশোধও নিতে পারব এবং দাঁও মারতে পারব। এ কাজটা কিন্তু আমরা আমাদের সর্দারের সম্পূর্ণ অমতেই করেছি। তবে যেই না বুঝেছি হাতটা আমাদের একেবারে উল্টো জায়গায় পড়েছে, মানে আমরা নিজেদের অজান্তে একজন পুলিশ অফিসারের ছেলেকে চুরি করে বসে আছি তখন কিন্তু খুবই বিব্রত বোধ করেছি আমরা।

অ্যাটম আর পেটো বলল—আহা। নেকু রে আমার, ছেলে-টাকে ছেড়ে দিলেই তো পারতে?

—ছেলেটাকে ছেড়েই দিতাম। যদি না ঐ শয়তান দু'টো গিয়ে পুলিশের সঙ্গে হাত মেলাতো। ওরা আমাদের অনেকগুলো গোপন ঘাঁটির সন্ধান জানে। ওরা আমাদের দলকে দল ধরিয়ে দিতে চাইছে। তাই পুলিশের চোখে ওদেরকেই সন্দেহভাজন করবার জন্যে ছেলেটার মাকেও নিয়ে পালিয়ে আসি আমরা। চালে আবার ভুল হয়। ভেবেছিলাম পুলিশ ঐ মা এবং ছেলের জন্যে হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি সুরু করলে আমরা সেই সুযোগে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পার পেয়ে যাব। কিন্তু না! রূপেন ও সুখেন কি যাদুতে পুলিশের বিশ্বাস উৎপাদন করেছিল তা কে জানে? ওরা দিব্যি পুলিশ নিয়ে আমাদের ঘাঁটি আক্রমণ করতে আসছিল। আমাদের দলে একটা হাবা ছেলে ছিল। আমরা তাকে পাঠিয়েছিলাম ঐ শয়তান দুটোকে শেষ করে দেবার জন্য। কিন্তু তার একটু ভুলের জন্য সব বানচাল হয়ে গেল।

—তা না হয় গেল। কিন্তু ছেলেটার মা কোথায় সেও কি ঐ ভাঙা বাড়িতেই আছে?

—আরে না-না। এক জায়গায় কখনো ছু'জনকে রাখে? তাঁকে আমরা অন্য জায়গায় রেখেছি। মানে আমাদের মূল ঘাঁটিতে।

—বেশ। এখন তাহ'লে আমাদের কি করতে হবে?

—কিছুই না। যেভাবেই হোক, ঐ রূপেন আর সুখেনের মুণ্ডু ছু'টো নিয়ে এসে আমাদের সর্দারকে উপহার দিতে হবে। পারবি না?

—এই তুচ্ছ কাজটুকু করতে যদি না পারি, তো মানুষ খুনের খেলা ছেড়েই দেবো আমরা।

এইভাবে কথা বলতে-বলতে এক জায়গায় গভীর বনের ভেতর এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। একজন লোক মুখ দিয়ে কুকুর ডাক ডাকল।

অমনি দূর থেকে শেয়ালের ডাক শোনা গেল হুয়া-হুয়া-হুয়া।

লোক ছু'টো এইবার টর্চ জ্বেলে এগিয়ে চলল। ছু' এক পা যাবার পরই দেখল কতকগুলো বড়-বড় গাছের গুঁড়ির আড়ালে একটি ছোট্ট চানা ঘর। তারই পিছন দিকে এক জায়গায় খড় চাপা দেওয়া একটা কাঠের পাটাতন। সেটা টেনে তুলতেই নিচে নামার সিঁড়ি দেখতে পাওয়া গেল। ওরা ধীরে-ধীরে সেই সিড়ি বেয়ে নিচে নামতেই আলো অন্ধকারে ভরা কতকগুলো ঘুপরি ঘরে এসে পড়ল। একটি ঘরে এক মহিলা বসে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। ছুটি অল্প-বয়সী মেয়ে তাঁকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করছে।

অ্যাটম আর পেটো বলল—ইনিই কি?

—হ্যাঁ। ছেলেটির মা। তবে সাবধান। ওনার ছেলেকে যে তোমরা মেরে ফেলেছো একথা উনি যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারেন। উঃ কি কুক্ষণেই যে এই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম।

অ্যাটম বলল—এই তাহ'লে তোমাদের ঘাঁটি? তা এখন পুলিশ এসে যদি ঘাঁটি আক্রমণ করে তাহ'লে পালাবে কোথায়?

—সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সমুদ্র মুখ পর্যন্ত একটা মানুষ প্রমাণ ব ড্রেনের সঙ্গে এই সুড়ঙ্গের যোগা আছে। এটা ডিনামাইট দিয়ে ধ্বসিয়ে সেখান দিয়ে আমরা পালাবো।

—অ। রুপেন আর সুখেন বুঝি সেই সমুদ্র মুখেও পুলিশ

পাঠাবে না ?

—ঠিকই বলেছ তোমরা। সেইজন্যে আমাদের কিছু লোক ইতি-মধ্যেই আরো একটি পালাবার পথ তৈরী করতে লেগে গেছে।

—কিন্তু তোমরা পুলিশ আসবার আগেই এখান থেকে পালাচ্ছো না কেন ?

—অসুবিধে আছে। নেহাৎ বেকায়দায় না পড়লে এই ঘাঁটি থেকে বেরবো না আমরা। কেননা এই ঘটনার পর পুলিশ এখন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কড়া নজর রেখেছে। আমরা এখান থেকেই চেষ্টা করছি পুলিশকে ঘাঁটির ধারে কাছে আসতে না দেবার। যাক। কথায়-কথায় রাত হয়ে যাচ্ছে। এখন তোমরা একটু অপেক্ষা করো। সর্দারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। এই বলে লোক দু'জন চলে গেল।

অ্যাটম আর পেটো তখন চারিদিক ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল। ভেতরে লোকজন কাউকেই তেমন দেখা গেল না। এক জায়গায় একটি বদ্ধ দরজার সামনে টুল পেতে এক প্রহরী বন্দুক হাতে ঘর পাহারা দিচ্ছে। অ্যাটম আর পেটো সেই ঘরের কাছে গিয়ে বলল—এই ঘরের ভেতরে কি আছে গো ?

প্রহরী রক্ত চক্ষুতে চেঁচিয়ে উঠে—ভাগো হিঁয়াসে।

অ্যাটম বলল—আমাদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলিস না বাবা। মেরে মুখ ফাটিয়ে দেবো এখুনি। আমরা তেইশটা মার্ডার করেছি। তুই কটা করেছিসরে রে ?

প্রহরীটা লাফিয়ে উঠে বলল—এক ফোঁটা ছেলে। কথা বলতে শিখিসনি ? কি করে এর ভেতর ঢুকলি তোরা ?

পেটো বলল—কি করে আবার ? তোর বাবারা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে।

প্রহরীটা পেটোর চুলের মুঠি ধরে চিৎকার করে ডাকল—জান্‌কি-পোরসাদ ! এ জান্‌কিপোরসাদ ! ইধার আও তো।

অ্যাটম প্রহরীটার পেটে সজোরে একটা লাথি মেরে বলল—জান্‌কিপ্রসাদ ক্যা কিয়েগা হামারা ? তুমহারা হিম্মৎ নেহি ? উল্লু কাঁহাকা ?

প্রহরীটা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে পেটোর চুলের মুঠি ছেড়ে অ্যাটমকে মারবার জন্য যেই না হাত ওঠাল অমনি এক বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বর গম-গমিয়ে উঠল সেখানে—রুখ্ যাও।

প্রহরী সচকিত হয়ে হা‌ত নামিয়ে সরে দাঁড়াল। অ্যাটম ও পেটো সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেই মূর্তিমান বিভীষিকার দিকে। দেখল দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ এক চাপদাড়ি সর্দারজী কালো চশমায় চোখ ঢেকে মাথায় পাগড়ি এঁটে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

যে লোক দুজন অ্যাটম ও পেটোকে এখানে নিয়ে এসেছিল তারাও যেন কিরকম কেঁচোর মত দাঁড়িয়ে আছে সর্দারজীর পাশে।

সর্দারজী তাদের বললেন—শোনো, তোমাদের এখানে থাকবার আর দরকার নেই। তোমরা বরং বাইরে পাহারা দাও। যদি বিপদ বোঝো আমাকে খবর দেবে। আমি এদের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। বলে অ্যাটম ও পেটোকে বললেন—আমার সঙ্গে এসো।

অ্যাটম ও পেটো সর্দারজীর সঙ্গে একটি সুসজ্জিত ছোট্ট ঘরে এসে ঢুকল। ঘরের দেওয়ালে একটি মাত্র কালীর ছবি ছাড়া আর কোন ছবি নেই। সর্দারজী ওদের বসতে বলে নিজেও বসলেন। তারপর বললেন—আমি তোমাদের মতো মারাত্মক কাউকেই খুঁজছিলাম। তোমরা যদি আমার হুকুম মতো চলতে পারো বা যদি দল ছেড়ে পালিয়ে না যাও, তাহ'লে আখেরে উন্নতি করবে ই হোক। আপাততঃ আমার দলে নাম লিখিয়ে দুটো মার্ডার করে তোমাদের হাতে খড়ি দিতে হবে আজ।

অ্যাটম বলল—কাকে মার্ডার করতে হবে বলুন?

সর্দারজী দু'টো ছবি বার করে ওদের হাতে দিয়ে বললেন—এই মুখ দু'টো চিনে রাখো এদের।

পেটো মিথ্যে করে বলল—আরে! এ মুখ তো আমরা চিনি। একদিন আমাদের দু'জনকে এরা আচ্ছা করে এমন ধোলাই লাগিয়েছিল যে কি বলব। কিন্তু কি দিয়ে মারবো সর্দার?

—কি দিয়ে মারতে তোমাদের সুবিধে হয়?

—যদি দু'জনে দু'টো ডিস্যুম-ডুস্যুম পাই।

—ওসব চালাতে পারো ?

অ্যাটম বলল—আগে দিন না। তারপর আপনারই পেটটা ফুটো করে দেখিয়ে দিচ্ছি পারি কি না।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সর্দারের একটি থাপ্পর খেয়ে ঘরের মেঝের ছিটকে পড়ল অ্যাটম। সর্দার নির্বিকার ভাবে বললেন—নাও। গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে বসো। ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় একটু সমীহ করে কথা বলবে।

এমন সময় দরজার কাছে দু'জন লোক এসে দাঁড়াতেই সর্দারজী বললেন–বলো।

—অল ক্লিয়ার সর্দারজী।

—কোথাও কিছু পড়ে নেই তো ?

—না। পুলিশ এর ভেতরে তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেও কোন কিছু পাবে না। সব পলিথিনের প্যাকেট মুড়ে বালিতে পুঁতে রেখেছি।

—মেসিনটা কোথায় রাখলে ?

—সোনার পাতগুলোর সঙ্গে বেঁধে।

—পরে জায়গাটা ঠিক চিনে নিতে পারবে ?

—হ্যাঁ সর্দারজী।

–জাল নোট কতগুলো আছে এখানে ?

—তা প্রায় দু' তিন বস্তার মতো।

—বিপদ বুঝলে এগুলো পুড়িয়ে দিও।

—আচ্ছা। বলে চলে গেল ওরা।

এমন সময় আরো একজনের আবির্ভাব হ'ল সেখানে। এই লোকটি বলল—সর্দারজী! সুখেন আয়া।

সর্দারজী একটুও বিস্মিত না হয়ে বললেন—আনে দো।

লোকটি চলে গেল এবং একটু পরেই সুখেনকে নিয়ে এসে হাজির করল সেখানে। সর্দারজী হেসে বললেন—বসো সুখেন। এই ছেলে দু'টিকে চেনো ?

অ্যাটম ও পেটোর দিকে তাকিয়ে সুখেন বলল—না। চেনা দূরের

কথা ওদের দেখিও নি কখনো।

—সেকি! তুমি নাকি ওদের বেধড়ক পিটিয়েছিলে?

—হবে। হয়তো খেয়ালই নেই।

—তা যাক গে। এখন বলো, তোমার ঐ পুলিশ বন্ধুদের ছেড়ে হঠাৎ এই গরীবের পর্ণকুটীরে এসে হাজির হলে কেন?

সুখেন কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল—সর্দার! আমাকে মাফ্ করুন সর্দার! আমি ঐ ব্যাটা রূপেনের কথায় দলছুট হয়ে খুব ভুল করেছি। আসলে ঐ ছেলে চুরির ব্যাপারে আমরা পুলিশের সন্দেহের চোখে পড়ে গেছি জেনে পুলিশকে বলতে গিয়েছিলাম যে ও চুরি আমরা করিনি। তারপর—

—আর কিছু বলার আছে তোমার?

—আমি আবার আপনার দলে ফিরে আসতে চাই সর্দার।

সর্দার হেসে বললেন—তা কি করে হয়? তুমি তো জানো দল-ত্যাগীদের আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া রূপেন ধরা পড়ে পুলিশের হেফাজতে আছে। এসব যদি তোমাদের অভিনয় না হয় তাহলে এতক্ষণে তো মারের চোটে সব কথা সে কবুল করে ফেলেছে। তুমি এখন যেতে পারো।

—সর্দার!

—ইউ মে গো। তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে আমার দলের বহু লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। আজই সন্ধ্যায় দীঘার সৈকতে সাত-সাতজন প্রাণ হারিয়েছে। ঐ হাবা ছেলেটা যখন অসমঞ্জবাবুকে আমাদের ঘাঁটিতে নিয়ে আসছিল তখন।

—অ। তাহ'লে আমি আপনাদের দলে ফিরে আসতে পারছি না।

—না।

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই পকেট থেকে রিভালভারটা বার করে সুখেন সর্দারের দিকে তাক করে বলল—এই অস্ত্রটা কতখানি পাওয়ারফুল তা নিশ্চয়ই জানা আছে?

—জানি।

—তাহ'লে শিগ্গির বলো, অসমঞ্জবাবুর ছেলে আর বউকে তুমি

কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ?

—আমার পাগড়িটা খুলে দেখো। হয়তো এর ভেতরে থাকতে পারে।

—রসিকতা রাখো। এই রিভলভার আমি তোমার কপালে ঠেকিয়ে রাখলাম। তোমার দলের লোকেদের এখুনি বলো তাদের ছেড়ে দিতে! নাহলে তুমি এখুনিই মরবে।

সুখেন, তুমি বড় বোকা। তুমি কি জান, তোমার পিছনে আমার কত লোক দাঁড়িয়ে আছে? রিভলভারটা এখান থেকে না লেরাস

ওরাই তোমাকে বরাবরের জন্য সরিয়ে দেবে।

—জানি। আমি মরবার জন্য তৈরী হয়েই এখানে এসেছি, আমাকে কেউ এতটুকু আক্রমণ করবার চেষ্টা করলে আমি তোমার খুলি ফুটো করে দেবো।

—হায়-হায় রে!

বলে একটু নাড়বার চেষ্টা করতেই সুখেন বলল—খবরদার হাত ওঠাবে না। আগে যা বলি তাই করো। এখুনি ওদের মুক্তি দাও—এক—দুই—তিন।

—রুখ্ গয়া কিঁউ? চালাও গোলি। ম্যায় মরণেকে লিয়ে তৈয়ার হুঁ।

অ্যাটম আর পেটো এইসব দেখে খুবই হকচকিয়ে গেল। ওরা ঘরের বাইরে তাকিয়ে দেখল অন্ততদশজন ভয়ঙ্কর চেহারার সশস্ত্র লোক নিঃশব্দে কখন যেন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

সর্দার একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন।

সুখেন বলল—উঁহু। আগে ওদের মুক্তি দাও তারপর ঐসব করবে। আমি নিজে বাঁচব না জানি। তবুও তোমাকে আমি মারব।

চোখের পলকে অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। তারপরই 'গুড়ুম' করে একটা শব্দ। এবং পরক্ষণেই একটি চাপা আর্তনাদ।

আলো জ্বলে উঠল আবার। ঘরের মেঝেয় রক্তাপ্লুত অবস্থায় সুখেনকে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে একবার শুধু বললেন—বদতমিজ কাঁহাকা। তাঁর হাতে একটি ঝকঝকে রিভলভার শোভা পাচ্ছে।

কয়েকজন লোক সুখেনকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

সর্দার অ্যাটম ও পেটোর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার সঙ্গে দুশমনি করার পরিণাম তো দেখলে? আশা করি আমার কাজ একটু যত্ন নিয়েই নিশ্চয়ই করবে।

অ্যাটম আর পেটো বলল—সর্দারজী। আমরা ঐ হাবা ছেলেটার মতো বোকামি করব না। আর বেইমানি করার তো প্রশ্নই উঠে না! আমরা লিডার খুঁজছিলাম। পেয়ে গেছি। এখন যন্তর দিন।

আমাদের কাজ করে আসছি।

সর্দার সুখেনের হাত থেকে খসে পড়া পুলিশের রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন এটাই নিয়ে যাও। খুব সাবধানে কাজ করবে। মনে রেখো, একটু অসাবধান হলেই মরবে তোমরা। পুলিশরাই মারবে তোমাদের।

অ্যাটম আর পেটো যেই বেরোতে যাবে, অমনি সেই লোক দু'টো মানে যারা ওদের নিয়ে এসেছিল তারা এসে বলল—বাইরে খুব গোলমাল সুরু হয়ে গেছে সর্দার।

—কিরকম!

—জঙ্গলের ভেতর দলে-দলে পুলিশ এসে ঢুকছে।

—ডরনেকা কোঈ বাৎ নেহি।

—আর সেই পুলিশ অফিসার। মানে মিঃ অসমঞ্জ রায়। যিনি দীঘা সৈকতে আমাদের গুলিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি হাসপাতালে মারা গেছেন।

—আফশোস কি বাৎ। তা কি আর করা যাবে? ছেলেটা তো আগেই মরেছে। এখন বাকি মা-টা।

—আমাদের মনে হয় ওনাকে আর অযথা আটকে না রেখে ছেড়ে দেওয়াই ঠিক।

সর্দার তেমনি শান্ত ভাবে মৃদু হেসে বললেন—নেহি। জগজিৎ সিং জ্যাঙ্গোর থাবা থেকে কারো মুক্তি নেই বন্ধু। ওনাকেও মরতে হবে! আপনা থেকেই যখন ক্রাইমটা তৈরী হয়ে গেছে, তখন এই তো ভালো। জ্যাঙ্গোর ক্যারেকটার বুঝতে এই রহস্যটা আরো রহস্যময় হয়ে উঠুক। পুলিশ গোয়েন্দারা ভাবুক। ভেবে-ভেবে কুল কিনারা হারাক। কিন্তু ক্রাইমের জগতে এই হত্যাকাণ্ডের কোন রকম সমাধান যেন কখনো না হয়। আমরা টাকা চাইলাম না, পয়সা চাইলাম না, কোন শর্ত রাখলাম না, শুধু অকারণে একটি ফ্যামিলিকে স্রেফ পুলিশ হওয়ার অপরাধে সরিয়ে দিলাম। কিন্তু কেন? কেউ জানবে না। এরই নাম প্যানিক। এই রকম মাঝে মধ্যে অপ্রয়োজনে দু'একটা খুন খারাপি না করলে ওরা কি করে

বুঝবে মিঃ জ্যাঙ্গো হাউ ডেঞ্জারাস ?

—তাহ'লে বলুন, কি ভাবে কি করব ?

—যা করবে তা হলো স্রেফ ঠাণ্ডা মাথায় খুন। তোমরা নতুন রাস্তা দিয়ে চলে যাও। আমাদের এলাকার বাইরে গিয়ে ঐ মহিলাকে তোমরা বলবে 'মুক্তি দিলাম'। এই ছেলে দুটি ঐ মহিলাকে সমুদ্রতীর ধরে দীঘার দিকে নিয়ে যাবে।

—তারপর ?

—তার আর পর নেই। দূর থেকে ঐ মহিলার জন্যে তোমরা একটি মাত্র বুলেট খরচা করবে। কেমন ?

অ্যাটম বলল—ঐ লোকটাকে মারবার কি হবে তাহলে ? যাকে মারবার জন্যে আমরা যাছিলাম ?

—দরকার নেই। সে এখন হয় লকআপে কড়া পাহারায় আছে। নয়তো সে নিজেই এই সব পুলিশদের পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছে। ওকে আমরা এ যাত্রা নয়। অন্য সময় সরিয়ে দেবো।

এমন সময় বুম-বুম-বুম করে কয়েকটা শব্দ।

সর্দার হেসে বললেন—যাক। এইদিক দিয়ে পুলিশের আক্রমণের আশঙ্কা থেকে আমরা বেঁচে গেলাম। এদিকের মুখ ডিনামাইট চার্জ করে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন বাকি রহিল শুধু সমুদ্র মুখটা।

অ্যাটম বলল—আমরা যদি ঐ মহিলাকে নিয়ে সমুদ্র মুখ দিয়েই বার হই তো ক্ষতি কি !

সর্দার এক মিনিট কি যেন ভেবে বললেন—না। না। না। রূপেন কি এ দিকের কথা পুলিশকে না জানিয়েছে ভেবেছ ? তোমরা নতুন পথ দিয়ে যাও। আর শোনো আমাদের দলের মেয়ে দু'টোকেও বাইরে বার করে দাও। ওদের বলে দাও ওরা যেন কাছাকাছিই থাকে। পরে আমরা ওদের খুঁজে নেবো।

সর্দারের কথা মতো তাই করা হল। সর্দার নিজে এসে সুজাতা দেবীকে মুক্তি দিলেন। বললেন—আপনাকে আমরা ছেড়ে দিলাম মিসেস রায়। আপনি এদের সঙ্গে যেতে পারেন।

সুজাতা দেবী আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন—কিন্তু আমার

ছেলে? সে কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?

—এখন আপনি তার কাছেই যাবেন। তাকে অন্য এক জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে। সেখানে খুব কান্নাকাটি করছে সে। তার জন্যেই আপনাকে আনা হয়েছে। যান।

—সত্যি বলছেন, আমাকে আমার ছেলের কাছে নিয়ে যাবেন?

—মিথ্যে বলে লাভ কি? যান দেরী করবেন না। আপানার ছেলের কাছেই আপনাকে নিয়ে যাছি আমরা।

সুজাতা দেবী আশান্বিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সর্দার অন্য মেয়ে দুটোকে বললেন—তোমরাও যাও তোমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে এখনকার মতো।

এমন সময় সমুদ্র মুখের সুড়ঙ্গর দিক থেকে এক জটা জুটধারী সন্ন্যাসীকে ধরে টানতে-টানতে নিয়ে এলো দু'জন লোক—সর্দার! এই দেখুন কাকে নিয়ে এসেছি? এই শয়তানটা ছদ্মবেশে এর ভেতরে দু'জন পুলিশকে নিয়ে ঢুকে পড়েছিল।

আরে! এ কি! রূপেনবাবু! এ কি চেহারা তোমার! একেবারে যোগীরাজ হয়ে গেলে রাতারাতি? বাঃ ভাই। তা জেনে শুনে সাপের গর্তে আঙুল ঢোকাতে এসেছিলে কেন?

ছদ্মবেশী রূপেন রক্তচক্ষুতে সর্দারের দিকে তাকিয়ে থুঃ করে থুতু ফেলল। সর্দার বললেন—এর সঙ্গের পুলিশ দু'টো কোথায়?

—সাদা পোযাকের পুলিশ সর্দার তাদের দু'টোকেই আমরা শেষ করে দিয়েছি।

—ভেরি গুড্। বলেই রূপেনের নকল জটা ও দাড়ি ধরে টেনে দিলেন সর্দার। টানা মাত্রই খুলে এলো সেটা।

রূপেন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল ওদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার কিন্তু পারল না।

সর্দার ওর অবস্থা দেখে হেসে বললেন—ইঁদুর জাঁতাকলে পড়লে ঠিক তোমার মতন করে। তোমার বন্ধু সুখেনের সঙ্গে দেখা করবার নিশ্চয়ই খুব ইচ্ছে হচ্ছে তোমার? এখন আমরা তোমার জন্যে সেই ব্যবস্থাই করব। তোমরা দু' বন্ধুতে পাশাপাশি শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে এবার। বলেই অ্যাটমকে বললেন—এই ছোকরা! তুমি তো কথায়-কথায় মানুষ খুন করতে পারো শুনেছি। পারবে খুব সামনে দাঁড়িয়ে এই ভণ্ড সাধুটার ভণ্ডামি দূর করে দিতে?

অ্যাটম বলল—কেন পারব না? বলে একবার পেটোর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

পেটো বলল—আমি।

অ্যাটম বলল—না, আমি।

সর্দার বললেন—ঠিক আছে। তোমরা দু'জনেই মারো। এক-সঙ্গে। এই নাও আমারটাও নাও। বলে নিজের রিভলভারটাও বার করে পেটোর হাতে দিলেন।

অ্যাটম আর পেটো দু'পা পিছিয়ে এলো।

সর্দার কোমড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—রেডি? ওয়ান—টু—থ্রি।

অ্যাটম ও পেটোর রিভালভার গর্জে উঠল 'গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম।' একটা পেটে, একটা বুকে একটা কপালে।

রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন জগজিৎ সিং জ্যাঙ্গো। অভাবনীয় ব্যাপার। চ্যাংড়া ছোঁড়া দু'টো করল কি?

অ্যাটম তবুও শান্ত না। রূপেনকে যারা ধরে এনেছিল তাদের বলল—শিগ্‌গির ছেড়ে দাও ওনাকে। ছাড়ো।

তারা হতভম্ব হয়ে রূপেনকে ছেড়ে দিতেই পেটো ওর রিভলভারটা রূপেনের হাতে দিয়ে বলল—দাদা! এবার আপনার কাজ আপনি করুন। আমরা এনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

সুজাতা দেবী অ্যাটমকে জড়িয়ে ধরে বললেন—কে বাবা তুমি। এই বিপদে এমন করে আমাদের সাহায্য করলে?

—আমরা আপনার ছেলে মা। আমাদের তো মা নেই। এখন থেকে আপনাকেই আমরা মা বলে ডাকব।

—বেশ। তাই ডাকবে।

—তাহ'লে চলুন। আর এখানে একটুও থাকা উচিৎ নয়। কখন কি বিপদ ঘটে কে জানে।

রূপেন ততোক্ষণে সব কটাকে শুইয়ে দিয়েছে মাটিতে।

অ্যাটম বলল—আপনিও আমাদের সঙ্গে চলে আসুন দাদা। এখানে একা না থাকাই ভালো। আপনার বন্ধু সুখেনবাবু একটু আগেই সর্দারের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

রূপেন বলল—তোমরা এক কাজ করো। ওনাকে থানায় পৌঁছে দিয়ে পুলিশ নিয়ে এদিকে চলে এসো। আমি ততোক্ষণ আড়ালে

কোথাও লুকিয়ে থেকে ঘাঁটি পাহারা দিই। যাতে ওরা এখান থেকে পালাতে না পারে।

অ্যাটম ও পেটো সুজাতা দেবীকে নিয়ে সুড়ঙ্গপথে ঘাঁটির বাইরে সমুদ্রমুখে এসে পড়ল।

সুজাতা দেবী বললেন—আমার ছেলের কোন খবর জানো? আমার বাপ্পা! সে কি বেঁচে আছে?

—তার জন্যে চিন্তা করবেন না মা। সে আমাদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়েই আছে। আগে আমরা আপনাকে থানায় পৌঁছে দেবো। তারপর তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব আপনাদের কাছে।

ওরা সমুদ্রতীর ধরে খুব জোরে পা চালিয়ে দীঘার দিকে রওনা দিল। অ্যাটম আর পেটো অসমঞ্জবাবুর মৃত্যু সংবাদটা বেমালুম চেপে গেল সুজাতা দেবীর কাছে। কি জানি যদি উনি এ সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়েন তাহলে তো ওনাকে নিয়ে পথ চলাই দায় হবে।

যাই হোক। বেশি দূর যেতে হ'ল না। এক বিরাট পুলিশ বাহিনী টহল দিচ্ছিল এক জায়গায়। ওরা সেখানে গিয়ে সুজাতা দেবীকে তাদের হাতে তুলে দিয়েই রূপেনের কথা মতো এক ঝাঁক পুলিশ নিয়ে চলো এলো সমুদ্র মুখে। কিন্তু একি! কোথায় কি? সমুদ্র মুখের সেই সুড়ঙ্গ পথ তখন ধ্বস নেমে রুদ্ধ হয়ে গেছে। রূপেন কেন? কারো অস্তিত্বই আর সেখানে নেই।

না থাক। ওরা আবার সেই অন্ধকারে পথ চিনে বালিয়াড়ী আর জঙ্গল পার হয়ে চন্দনেশ্বরের দিকে চলল। রাত শেষ হয়ে এসেছে তখন। ভোরের পাখিরা কলরব শুরু করে দিয়েছে। আকাশের তারাগুলি তখনও জ্বলছে মিটিমিটি। অনেক পথ পার হয়ে ওরা যথাস্থানে এসে পৌঁছুল।

অ্যাটম আর পেটো সেই গাছতলায় পৌঁছে চেঁচিয়ে ডাকল—বাপ্পা। বাপ্পা ভাই নেমে এসো। আমরা এসে গেছি।

কিন্তু না। ওদের অনেক ডাকা ডাকিতেও নেমে এলো না কেউ। অ্যাটম আর পেটো সেই শক্ত লতা ধরে চড় চড় করে ওপরে উঠে দেখল কেউ কোথাও নেই। আবার রহস্যময় ভাবে উধাও হয়ে গেছে বাপ্পা।

## ১০
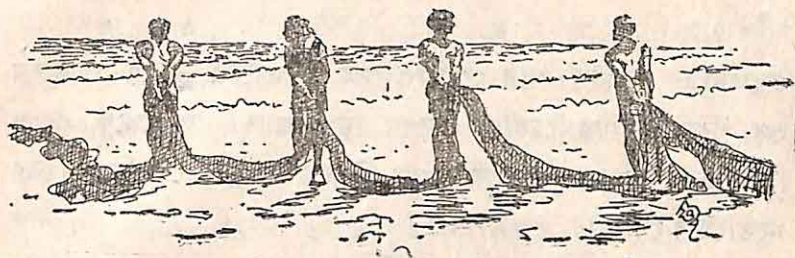
না। দীঘা সৈকতে আর কোন আতঙ্ক নেই। আজকের এই সূর্য-করোজ্জ্বল সুন্দর সকালে সবার মুখে তাই হাসি। অঞ্চলের সন্ত্রাস কুখ্যাত দস্যু জাঙ্গোর মৃত্যু যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়েছে সকলকে। ওদের দলের কাউকেই ধরা যায়নি যদিও তবুও নিজেদের ফাঁদে নিজেরা ধ্বস চাপা পড়ে মরেছে বলে পুলিশ প্রশানন জনসাধারণ সবাই খুশি।

খুশির আরো একটা কারণ আছে।

কাল সন্ধ্যার অন্ধকারে অসমঞ্জবাবুর মৃত্যু সংবাদটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেও আজ সকালে জানা গেছে তিনি বেঁচেই আছেন। এবং সুস্থ শরীরে এখানকার হাসপাতালে বিশ্রাম করেছেন। জ্যাঙ্গোর দলের আততায়ীরা তাঁকে গুলি করলেও সেটি তাঁর বাঁ কাঁধের ওপর দিকে লাগে। সাময়িকভাবে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন যদিও এখন তিনি অপারেশনের পর সম্পূর্ণ সুস্থ। শুধু ক্ষতস্থানটা শুকিয়ে যেতে যেটুকু সময় লাগে।

কিন্তু তবুও এই খুশির শেষেও একটু অখুশির রেশ আছে। দীঘা সৈকতে আতঙ্ক না থাকলেও এখন যা আছে তা শুধুই রহস্য। অর্থাৎ যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই বাপ্পাই তো নেই।

সুজাতা দেবী পাষাণ প্রতিমার মতো বসে আছেন।

অসমঞ্জবাবু উদাস চোখে বসে আছেন জানালার বাইরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে। এছাড়া উপায়ই বা কি? আর কিছুই তো ভাবতে পারছেন না তিনি। অ্যাটম আর পেটোর কথা সুজাতা দেবীর মুখ থেকে শুনেছেন। এই দুই অসম সাহসী ভুঁইফোঁড় হঠাৎ না গজালে বাপ্পা বা সুজাতা দেবী কারো হদিশই পাওয়া যেত না। সুজাতা দেবী ফিরে এসেছেন। কিন্তু বাপ্পা? বাপ্পা কই? কোথায় গেল

ছেলেটা? অ্যাটম আর পেটোও নেই। তাদের নামই শুনেছেন শুধু, কিন্তু তাদের চেহারা দেখেন নি। কাল রাত থেকে এরাও নিখোঁজ। যেমন ধূমকেতুর মতো উদয় হয়েছিল তেমনি কর্পূরের মতো উবে গেছে।

অসমঞ্জবাবু এবং সুজাতা দেবী যখন চুপচাপ বসে-বসে বাপ্পার কথা ভাবছিলেন সেই সময় হঠাৎ বাইরে প্রচণ্ড কোলাহল।

একজন লোককে ধরে টানতে-টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল পুলিশের লোকেরা। এটা হাসপাতাল হলেও আলাদা একটা কেবিন তাই রক্ষে। অসমঞ্জবাবু লোকটির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। এ তো সেই লোক যাকে তিনি মনে-মনে সন্দেহ করেছিলেন। লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ঘরের মেঝেয়। ওর হাতের বল্লমটি ছিট্‌কে পড়ল এক কোণে! লোকটি মেঝে ধরে কোনরকমে উঠে বসল। তারপর বল্লমটি টেনে নিল ধীরে-ধীরে। বল্লমের ডগায় জমাট লাল রক্ত।

—একি! রক্ত! রক্ত কেন?

—ওকেই জিজ্ঞেস করুন স্যার। এই বল্লমটা দিয়ে একজন লোককে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে মেরে তাকে টানতে-টানতে রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসছিল। লোকটা যে এরকম শয়তান তা আমরা এর আগে বুঝতে পারিনি। উঃ কি সাংঘাতিক!

অসমঞ্জবাবু বললেন—তাই যদি হয় তাহলে ওকে আমার কাছে নিয়ে এলে কেন? থানায় নিয়ে যাও।

—থানাতেই নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগে ও একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

—আমার সঙ্গে? কেন, কি ব্যাপার!

লোকটি আস্তে করে বলল—বাবু! বাবুমশায় গো! আমার অপরাধ লিবেন না—

আমার নাম অ্যান্টনি ধিড়িঙ্গী
নইকো ট্যাঁস নই ফিরিঙ্গি
নই হিন্দু নই মুসলমান
নই পার্শী নই কেরেস্তান

কিন্তু বাবু আমি এক মনিষ্যি বটে। এই যে বল্লমের ডগায় লাল অক্তটা দেখতেছেন এই অক্ত আমার শরীলেও বইছে। সবাই বলে আমি নাকি 'ব্রেনলেস'। বাট আয়্যাম নাউ সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড। আই নোজ টু প্লাস টু ইজিক্‌ল্‌টু ফোর। থ্রি ইনটু থ্রি ইকিক্‌ল্‌টু নাইন এ্যাণ্ড ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইজিক্‌ল্‌টু জিরো। আমি দীর্ঘদিন ধরে একটা লোককে খুন করব ভাবছিলাম। আজ করেছি। সে আমার একমাত্র সন্তানকে বিপথগামী করেছে। অনেক সময় হাতের মুঠোয় লোকটাকে পেয়েও কিছু করতে পারিনি। কারণ ওকে খুন করে আমি জেলে গেলে আমার ছেলেকে রক্ষা করত কে? এখন আমার ছেলে নেই। কিন্তু আমি আছি। আমার জেল হলে আমি সুখে থাকব। ফাঁসী হলেও দুঃখ নাই।

অসমঞ্জবাবু বললেন—বেশ তো। কিন্তু এই ব্যাপারে তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?

-দুর্গা মায়ী বাচাকা রাখ্‌খা। শুধু আমার একটা প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে। খুনিরা তো খুন করে পালায়। ধরা পড়লে তাদের ফাঁসী হয়। কিন্তু আমি যে খুন করে খুনের লাশ নিয়ে শহরময় ঘোরালাম আমার কি শাস্তি হবে? আমি নিজে ধরা না দিলে আপনাদের পুলিশ আমাকে ধরতে পারত না। তা যদি পারত তাহ'লে বাবু যে ছেলেটা আপনাদের চোখের সামনেই 'গুম' হয়ে ছিল তাকে আপনারা ঠিকই খুঁজে বার করতে পারতেন।

—কার কথা বলছ তুমি?

—আপনি একজন ঝানু গোয়েন্দা। বুঝতে এত দেরি করলেন বাবু? আমি আপনার ছেলের কথাই বলছি। আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আমার ছেলেটাই তো ফিরল না। তা বাবু আমার ছেলের রক্তের দামটা আপনারা কিভাবে দেবেন? খারাপ কাজ করলে তো আপনাদের আইনে শাস্তি মেলে। কিন্তু ভালো কাজ করলে তার জন্যে কিছু ইনাম তো মেলা উচিৎ? আমার ছেলে ডাকু ছিল, লুটেরা ছিল, আইনের চোখে দাগী ছিল। কিন্তু বাবু আপনার বউ-বাচ্ছার জান বাঁচাতে সে তার জীবন দিয়েছে।

আমার ছেলের নামে ছলিয়া বাবু। তাই আপনার কাছে আমার একটাই আর্জি স্রেফ ইনাম হিসেবে ওর নামের পাশে একটু কিছু ভালো কথা লিখে দেবেন।

অসমঞ্জবাবু অবাক হয়ে বললেন—তুমি কার কথা বলছ বলতো? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

লোকটি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে বলল—আমি ঐ হতভাগা সুখেনটার বাবা বটে।

অসমঞ্জবাবু এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আপনি সুখেনের বাবা?

—হ্যাঁ। আমি ওর বাবা। তবে বাবু, আমি তো শ্রীমান অ্যাণ্টনি ধিড়িঙ্গী। আমি একটা খুনী। আমি নেউল দাসকে মার্ডার করে রাস্তায় ঘোরাচ্ছিলাম। আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না। ঐ ব্যাটা নেউল দাস আপনার ছেলেটাকেও নিয়ে ভাগছিল। ভাগ্যিস চোখে পড়ল আমার। রাগের মাথায় দিলাম বল্লমটা ওর পেটের ভেতর ঢুকিয়ে।

—আমার ছেলেটা? তার কোন ক্ষতি হয়নি তো?

—না! বহুকষ্টে ছেলেটাকে উদ্ধার করে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তা ব্যাটা ঠিক টের পেয়ে সেখান থেকে নিয়ে পালাবার তাল করছিল। এখন বাবু আপনি আমাকে ডবল ফাঁসীর হুকুম দিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। তবে কিছু মনে করবেন না বাবু, আপনারা পুলিশরা কোন কাজের নন। সেইজন্যেই ছেলেটা ক'দিন এত কষ্ট পেল। আপনারা শুধু পেটাতেই জানেন। কাজ জানেন না।

অসমঞ্জবাবু আর সুজাতাদেবী হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—কোথায়? কোথায় আমার ছেলে? কোনখানে কিভাবে আছে সে?

—ছেলেটা আমার কাছেই আছে বাবু। কাল সারারাত সে একটা গাছের ডালে ছিল। এখন বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। বাবু, আপনারা যখন শহর তোলপাড় করতেন, বন-জঙ্গল ঢুঁড়ে ফেলতেন আমি তখন সি. আই. ডি. বনে গিয়েছিলাম। ছেলে হারানোর ব্যথা আমার চেয়ে বেশি আর কে বোঝে বাবু? তবে এই কাজের জন্যে সবচেয়ে বেশি

কৃতিত্ব যারা দাবী করতে পারে তারা হ'ল অ্যাটম আর পেটো নামে দু'টি ছেলে। ঐ দুই ক্ষুদে মস্তান যেমনি বদ, তেমনি বিশ্বাসী। একটি পোড়ো বাড়ির আণ্ডার গ্রাউণ্ডে আপনার ছেলেকে আবিষ্কার করার পর যখন তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে ওরা তখন থেকেই আমি ওদের নজরে রাখছিলাম। ওরা আপনার ছেলেকে উদ্ধার করে চন্দনেশ্বরের বাদাম বনে একটি গাছের মগডালে মাচার শুইয়ে রেখে শয়তানের ঘাঁটি আবিস্কারে যাচ্ছিল যখন আমি তখন সেই নির্জনে বল্লম হাতে একাই ওকে পাহারা দিচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম ওরা ফিরে এলে সবাই একসঙ্গে ছেলেটাকে আপনার হাতে তুলে দেবো। কিন্তু তার আগেই দেখি নেউল দাস ছেলেটাকে গাছ থেকে নামিয়ে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ভাগবার তাল করছে। গেল মাথাটা গরম হয়ে···। বাবু, জগজিৎ সিং জ্যাঙ্গোর সব লোকই মরেছে। শুধু বাকি ছিল ঐ নেউল দাসটা। ওটাকে আমিই শেষ করে দিলাম।

—আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ ধিড়িঙ্গীবাবু। আপনি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন। আই মাস্ট ডু ফর ইউ।

লোকটি বলল—আসুন তাহলে আমার সঙ্গে।

সুজাতা দেবী অসমঞ্জবাবুকে বললেন—তুমি না। এখন তোমার কোথাও না যাওয়া উচিত। আমি যাই। আমি বাপ্পাকে নিয়ে এসে তোমার কোলে তুলে দেবো।

অসমঞ্জবাবু বললেন—না-না। আমিও যাব। তাছাড়া ও একটু আধটু ব্যাথায় আমার কিচ্ছু হবে না। আমার বাপ্পাকে ফিরে পাবো শুনে আমি আমার পূর্ব শক্তি আবার ফিরে পেয়েছি তা কি জান?

অসমঞ্জবাবু ও সুজাতা দেবী দুজনেই চললেন লোকটির সঙ্গে বাপ্পাকে ফিরিয়ে আনতে। সঙ্গে চলল দু'তিন গাড়ি পুলিস।

চন্দনেশ্বরের মন্দিরের সামনে গাড়ি থামতেই দলে দলে লোক এসে ভীড় করল সেখানে। দু'জন পাণ্ডা গলায় ফুলের মালা পরানো বাপ্পাকে নিয়ে এসে সমর্পণ করল অসমঞ্জবাবু ও সুজাতা দেবীর হাতে।

বাপ্পা তো মা-বাবাকে পেয়ে খুসির জোয়ারে উপচে উঠে জড়িয়ে ধরল দু'জনকে।

সুজাতা দেবী ও অসমঞ্জবাবুও বাপ্পাকে বুকে জড়িয়ে স্থির হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁদের দু'জনেরই চোখে তখন আনন্দের অশ্রু।

এরই মধ্যে ফাঁকে বাপ্পা 'নীতা সিং' এর নাম লেখা সেই রূপোর পদকটিকে বার করে অসমঞ্জবাবুর হাতে দিয়ে বলল—বাপি এইটা তোমার কাছে রেখে দাও। সেদিন বালিয়াড়ীতে এই পদকটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আমার কি মনে হচ্ছে জান বাপি, এই 'নীতা সিং'কেও বোধ হয় আমার মতো জোর করে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল কেউ। তুমি তো অনেক কিছুই জান বাপি, একটু খোঁজ নিয়ে দেখবে এই 'নীতা সিং' কখনো তার মা-বাবার কাছে ফিরে যেতে পেরেছিল কিনা ?

অসমঞ্জবাবু পদকটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বললেন—নিশ্চয়ই দেখব বাবা। এখন থেকে এই কাজের দিকেই আমি বেশী করে জোর দেব।

সুজাতা দেবী বললেন—আর দেরী নয়। এখন চলো যাঁর কৃপায় আমরা আমাদের হারানিধিকে ফিরে পেয়েছি সর্বাগ্রে তাঁর পূজার কাজটা সেরে আসি।

পাগলা অ্যান্টনি মন্দিরের চাতালে বসে ছেলের শোকে মাথা খুঁড়ে বিলাপ করতে লাগল।

অসমঞ্জবাবু ও সুজাতা দেবী ছেলেকে বুকে নিয়ে পূজার ডালি হাতে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলেন।

॥ শেষ ॥